বাতায়ন

"End is the new beginning."

We would like to thank everyone for being a part of our journey and watching us grow this year and we hope to continue to do so in 2018.
We wish all of you a fantastic holiday season and
new year filled with joy, peace, and a lot of good reading.

দশম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৭

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

Issue Number 10 : December, 2017

EDITORS

Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

PHOTO CREDIT

Soumen Chattopadhyay, IL, USA	Front Cover: Appalachian Trail, NH Back Cover: White Mountains, NH
Tirthankar Banerjee, Perth, Australia	Inside Front Cover: King's Park, Perth Title Page: Esperance, Western Australia Inside Back Cover: Queen Victoria Building, Sydney

DESIGN AND ART LAYOUT

Kajal & Subrata, Kolkata, India

PUBLISHED BY

BATAYAN INCORPORATED, Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সূচীপত্র

English Section

Peaceful Blue World
Allen F. McNair 8

Compassion Moves a World
Allen F. McNair 9

East, West of Eden©
Mita Choudhury 10

From the Field: Switzerland August 2017
John Knight 10

Part of this Body
Viola Lee 14

The Green Eyed Monster
Debu Mukerji 15

Herland by Charlotte Perkins Gilman : A Book Review
Jill Charles 20

Home, More or Less
Kathy Powers 22

The old boy got to thinkin' . . .
Larry Ambrose 23

All Things Must Pass
Daniel Staub Weinberg 24

A Collection of Birds 25

Photo Gallery
Atanu Biswas 26

Bangla Section

— কবিতা —

মনের বাতায়নে বসে
সৌমেন চট্টোপাধ্যায় 29

ভোরের স্বপ্ন
সুজয় দত্ত 31

অমৃতস্য
সুজয় দত্ত 32

শিশু দিবস
সুদীপ নাথ 33

প্রেমিক
সুদীপ নাথ 33

নীললোহিত
সুদীপ নাথ 33

ফটিকের পুজো
আনন্দ সেন 34

ঘুম
ধীমান চক্রবর্তী 37

লা ফাম ফাতাল
ধীমান চক্রবর্তী 37

লিমেরিক
শুভ্র দত্ত 38

দেয়াল
মৌসুমী ব্যানার্জী 39

প্রকৃতির রোষ
নন্দিতা রায় 42

চেনা মুখ
অতীশ ব্যানার্জ্জী 43

সেন . . . স্
অতীশ ব্যানার্জ্জী 44

আড়ি
দেবাশীষ ব্যানার্জী 45

আমাদের কবিতা
সন্দীপ ভট্টাচার্য্য 46

— গল্প —

স্মৃতি – সত্তা – অনুপম
মানস ঘোষ 47

কল্প
ইন্দ্রানী দত্ত 50

বইপাড়ায় বৃষ্টি
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় 53

যেবার পেলে এসেছিল
বিশ্বদীপ চক্রবর্তী 55

— অনুগল্প —

একটি ছোট্ট আধুনিক নারীবাদী রূপকথা
ধীমান চক্রবর্তী 62

মেঘ বালিকা
মীরা চ্যাটার্জী 63

— নাটক —

অলৌকিক
সুদীপ্ত ভৌমিক 64

— স্মৃতিচারণ —

'মেরাজকে'-র স্মৃতি
প্রশান্ত চ্যাটার্জী 69

Sir Don Bradman
সিদ্ধার্থ দে 72

— রন্ধনপ্রণালী —

পটল পুরাণ
জয় মুখোপাধ্যায় 75

— রম্যরচনা —

ছট পরব – সূর্যের আরাধনা
মমতা দাস 77

সম্পাদকীয়

শব্দ, সাহিত্য ও মনের জানালা

সম্প্রতি মহাশ্বেতা দেবীর একটি সাক্ষাৎকার পড়লাম। ৩১শে জুলাই, ২০১৬, এই সময় সংবাদপত্রের রবিবারোয়ারিতে প্রকাশিত হয় এই সাক্ষাৎকার। মহাশ্বেতা দেবীকে যখন প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি যখন মনটা গুছিয়ে বসেন – লেখাটা কি সামনে ছবির মত দেখতে পান ? ---- লেখার কলাকৌশল, সেটা কি আপনাকে ভাবায় ? নাকি, আপনি লেখাটাকে তার নিজের গতিতে বয়ে যেতে দেন ? ---' উত্তরে তিনি জানান যে নতুন কোন শব্দ পেলেই নোটবইতে সেটা টুকে রাখেন তিনি। উদাহরণস্বরূপ লেখিকা উল্লেখ করেন বেশ কিছু স্বল্প পরিচিত বাংলা কথার – যেমন পর্ণনর, সুভিক্ষ, পাপপুরুষ ইত্যাদি। এইসব শব্দের নেপথ্যে আছে ছোট ছোট ইতিহাস। তাঁর নিজের ভাষায়, '--- যখনই আমি এই ধরণের কোনও ইন্টারেস্টিং শব্দ পাই, সেগুলো টুকে রেখে দিই। --- চতুর্দিকে এত শব্দ, এত রকম ধ্বনি --- যখনই এই ধরণের কিছু শুনেছি, সংগ্রহ করেছি।' সেইসব শব্দ আর শব্দের ইতিহাস থেকেই কি সৃষ্টি হয়েছে 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী', 'বাঁয়েন' এর মত কালজয়ী ছোটগল্প বা 'হাজার চুরাশির মা' এবং 'অরণ্যের অধিকার' এর মত উপন্যাস ?

ইংরাজী ২০১৭ সাল শেষ হচ্ছে। শুরু হবে একটি নতুন বছর। বাংলায় ডাক সংক্রান্তি বলে একটি কথা আছে। চৈত্র সংক্রান্তির আর একটি নাম। চৈত্র সংক্রান্তি বাংলা বছরের শেষ দিন। ডাক মানে ডেকে যায়। কে শোনে সেই ডাক ? যার মনের জানাল খোলা সেই শুনতে পায় সেই ডাক। কার ডাক ? বিদায়ী বছরের ডাক। যে বছর চলে যাচ্ছে সে ডেকে যায় যাবার বেলায়। প্রশ্ন রেখে যায়, তুমি কি করলে এ বছর ? কি ভাবলে ? আগামী বছরের স্বপ্ন দেখার বীজ বুনেছ কি এই বছরে ? এই যে একটি বছর চলে যাচ্ছে, এ আর ফিরবে না কখনোই। এ ভাবনাটা মনে একটা শূন্যতাবোধ আনে – আনে হারানোর বেদনা। কিন্তু এটাই আবার সময়টার প্রতি একধরণের ভালবাসার বোধও সঞ্চার করে। এই মুহূর্ত এখানেই শেষ – তা জানা আছে বলেই কোনখানে ফাঁক না রেখে পেতে চাই একে। আর তাইজন্যই বিদায়ের মুহূর্তও সুন্দর – বিষাদে সুন্দর। শুধুই কি বিদায়ের বিষাদ ? ভবিষ্যতের নতুন প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনাও তো নিহিত আছে এই বছরশেষের মুহূর্তে। এই সব নানা প্রশ্ন আর তার উত্তর ভাবতে গেলে শব্দের আশ্রয় নিতে হয়। আমাদের মনের আবেগ, অনুভূতি শব্দ অবলম্বন করে গড়ে ওঠে, বেঁচে থাকে আবার কখনও কখনও প্রকাশ পায় গল্প, গান, কবিতা বা নাটক – এককথায় সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবি-সাহিত্যিক মেরী অলিভারের ভাষায়, "I did not think of language as the means to self description. I thought of it as the door-a thousand opening doors! —past myself. I thought of it as the means to notice, to contemplate, to praise, and, thus, to come into power." মনের জানালার ভিতরের ও বাইরের ছবি আঁকতে তাই ভাষা আর শব্দ। ভাষাতেই দেখা, ভাষাতেই ভাবনা, ভাষাতেই প্রকাশ। আমাদের বছর শেষের 'বাতায়নে' আছে নানা স্বাদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং স্মৃতিচারণ। বাংলা ও ইংরাজী, এই দুটি ভাষাতেই লেখা প্রকাশ করি আমরা। বাংলার বাইরে বসবাসকারী বাঙালীদের লেখা প্রাধান্য পায় 'বাতায়ন' পত্রিকায়। শিকড় থেকে বেশ দূরে ডালপালা ছড়ান যে গাছ তাতেও ফুল ধরে, ফল হয়, ঘটে পাতার রঙ বদলও। প্রবাসের বাঙালী জীবনের জলছবি কিছুটা অন্যরকম। ভাষাটা দুই বাংলার সঙ্গে এক হলেও অনেক কিছুই পাল্টে গেছে অনাবাসী বাঙালীদের জীবনে। তাদের সেই জীবনের ছবি ও বাংলার বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বাংলা চর্চার একটা চিত্র তুলে ধরার আন্তরিক চেষ্টা করে চলেছি আমরা। আপনাদের আগ্রহ, ভালবাসা ও সহযোগিতা ছাড়া এই প্রচেষ্টা বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। আশা করি আগামী বছরে আপনাদের ভালবাসায় আরও সমৃদ্ধ হবে 'বাতায়ন' পত্রিকা।

সাহিত্য কখনওই ভৌগোলিক সীমানার বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখার বিষয় নয়। ভালবাসা, অভিমান, সুখ, আনন্দ-বেদনার মতো অনুভূতি সার্বজনীন এবং দেশ-কাল নিরপেক্ষ। বিভেদ ভুলে সারা পৃথিবীকে মৈত্রী বাঁধনে বেঁধে নেওয়ার এক অপূর্ব ক্ষেত্র হল সাহিত্য। সেই চিন্তা মাথায় রেখে 'বাতায়নে' ইংরাজী বিভাগের সংযোজন। বেশ কিছু অবাঙালী ও অভারতীয় বন্ধু নিয়মিত লেখা দেন 'বাতায়নে' এবং 'বাতায়ন' পড়েন। ইংরাজী বিভাগটি সম্পাদনা করেন জিল চার্লস। আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই তাকে।

নতুন একটি বছর শুরু হতে চলেছে। যে কোন সূচনাই যে আমাদের মনে সবসময় আশার আলো জ্বালায় এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। বিশেষ করে আজকের দিনে যখন আঘাতে প্রত্যাঘাতে জর্জরিত সারা বিশ্ব, হিংসার করাল রূপ মাঝে মাঝেই প্রকট হচ্ছে এখানে ওখানে, তখন আগামী বছরটা কেমন কাটবে তা নিয়ে মনে সন্দেহ দেখা যায় বৈকি ! কিন্তু 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।' রাতের তপস্যা শুভদিন আনবেই এই আশায় বুক বেঁধে আগামীর পানে এগিয়ে চলা। পয়লা জানুয়ারী আসছে। সব জায়গায় ইংরাজী বর্ষবরণের উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই শুভক্ষণে হুতোমের উদ্ধৃতি ধার নিয়ে বলি, 'বুড়ো বৎসরের অধীনে আমরা যে সব কষ্ট ভোগ করেচি, যে সব ক্ষতি স্বীকার করেচি-আগামীর মুখ চেয়ে, আশার মন্ত্রণায় আমরা সে সব মন থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জন দিলাম।'

২০১৭র বর্ষশেষের 'বাতায়ন' "End is the new beginning" আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। আশা করি ভাল লাগবে আপনাদের। আগামী বছর সকলের খুব ভাল কাটুক। সুখ, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধিতে সকলের জীবন উজ্জ্বল হোক এই আশায়,

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

''নব আনন্দে জাগো আজি –''

Photo Credit

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science, Native American flute and Indian classical music. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago with his wife, Ranjita, and his daughter, Suranjana is a Junior in UW Madison.

Tirthankar Banerjee's interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

Editorial

Can all people on Earth really live like sisters and brothers? Studies of our human DNA reveal that each human now living has mitochondria in their cells from one common female ancestor who lived in Africa in the Pleistocene Era. Our cells prove that we are all related. Can we see past our differences instead of fighting about them? What kind of siblings will we be?

We speak over 6,000 languages and dialects and live in 195 countries. Wars have been waged and cultures decimated and enslaved with the excuse of race difference, but studies of the human genome found no race gene differentiating one group from another, only minor variations on genes for hair, eye and skin pigment. Gender differences between male and female derive from one tiny chromosome differing: xy for male and xx for female. Even in those categories we often taken for granted, variations like x, xxx, xxy, and xyy can occur. How much of our racial, cultural and gender identity is inborn? How much of our behavior is learned from our environments, cultures and families? And how much do our choices define our lives?

In the pages of *Batayan,* I have seen countries I could never visit, and met great writers and artists from around the world. I have witnessed joyful holidays and devoted prayers of different faiths and seen their common truth "Compassion Moves a World" as in the poem by Allen McNair. The daily struggle of physical labor in "Part of This Body" by Viola Lee and Kathy Powers' search for a safe, affordable "Home, More or Less" bring instant empathy. We can climb the Swiss Alps with John Knight and walk the beaches of Brazil with Atanu Biswas. We can even reach for the imaginary to better understand the real, like the fictional all female country in Herland, Charlotte Perkins Gilman's rediscovered sci-fi novel, reviewed by me in this issue.

Our differences allow us to teach each other instead of fearing strangers. We face political and economic crises of war, poverty and pollution but we do not face them alone. The best hope to end all forms of prejudice and bring natural empathy to actions of justice is to see our shared world through the eyes of another. Thank you for reading *Batayan* and for opening that window into your lives.

Happy Holidays to All,

Jill Charles
English Editor

Peaceful Blue World

Allen F. McNair

Compassion Moves a World

Allen F. McNair

When compassion moves a world,
People will come together soon.
Everyone will rally to each other
With a love that can stir their hearts.

When compassion moves a planet,
Nations will live in peace eternally.
And borders will become truly passé
The walls between ourselves will crumble.

When compassion soon rules our hearts,
Women and men will live in true equality.
Children will recognize their brothers in
The nature of their hearts instead of colors.

When compassion opens, each other's being
Will radiate as the stars' full light beams.
Our world will fully illuminate everyone's auras
Of joy and camaraderie in full effulgence.

When compassion begins to light up our globe,
Wars will cease to command our ignorance.
Brothers and sisters will dance in joyful song.
Religions will find their common ground in beliefs.

When compassion rings true in every heart,
Sadness will be a feeling of our distant past.
The bells will ring together as one joyous chord
From every mountaintop through every valley low.

When compassion stirs every living soul,
The very fertile soil will ripen in fruitful harvest.
Rich fruit and grain will fill every contented person.
Deprivation will no longer ring on any open door.

Let compassion be found in a mother's arms,
Encircling her child in one fond embrace.
Let each one of us enfold the other in joy.
And join in one bright song of togetherness.

I, **Allen McNair**, am a self-taught artist and poet inspired daily by the wonders of life around me, and by my present and past experiences. From individual poetic portrayals in my early years of writing, I have graduated to writing and illustrating my self-published epic saga, *I Dream of A 'maresh*.

East, West of Eden ©

Mita Choudhury

She is from East
He is from West
of a dead divide, broken borders, porous hearts.

The bridge still stands majestic and Blue.
Western bombs, eastern defiance, Elbe flows,
sourced in natural hatred, wonder,
bathed in beauty.

Catholicized, later coded red, now free from the rituals of church-going albatrosses. The church bells toll and mark passages of Nuremberg judgements. Stalemate.

February 1945. Retaliation, Anglican arrogance; America casts itself as attack vector.

Amid Catholic and Bundestag bluster, Elbe flows toward the border of dead pilgrims and deafening divides, once again listening to renewed balls of hateful fire, seeping through the river banks of silent resistance.

Remembrance of things past? Rapeseed like daffodils fall prey not to balls
of Trojan tyranny. Unidentified infestation.

The Elbe flows, follows, absorbs the noises of now gutted in West and immanent affluence.

Hermaphroditism, offering spells of duality.

Death, lost identity, echoes of cantankerous choruses. East is West. Alien blood blends, bends in the river.

She is from East, he is from West of rivers incarnadine. Games of "blood and roses" enacting neo-dances of death sustain Capital.

Euro flows west.

Mita Choudhury, a tenured professor at Purdue Northwest, is an expert in the cultural history of Britain and has published articles and books on interculturalism, migration, borders, colonialism, and related issues.

From the Field: Switzerland August 2017

John Knight

Day 1.

After a torrid and delayed exit from the Czech Republic, we arrive via an overnight train at Bern 24 hours later than planned. To our surprise we recognize our host's 14-year-old son searching the platform for us. We let him search for a few minutes, not wanting to spoil his surprise, but not really having the energy to chase a teenager around a crowded rail station when we are reduced to 3 hours sleep in the last 2 days.

We bump into him and ask "if he needs directions to Uttigen?" With his mobile he texts his parents saying he found the lost and late Australians. Fabian spends the next 20 minutes on a the train from Bern practicing his excellent English giving us a brief on how the Swiss rail system works and how we can get from here to there.

This sub-adult European Ibex, a type of wild goat, is silhouetted against the clear blue Summer Alpine sky. He is taking one last look back before leaving his companions in the vertical search for greener pickings in this stone made landscape.

Observations: There are large cities here, but also what is best described as villages. Between the villages is commercial agriculture. This agriculture includes dairy, broad acre cropping, some livestock including sheep, beef cattle and deer behind the high wire, lamas and to my utter amazement North American Bison! These villages are nearly self-contained dormitories. They'll have a supermarket, cash point, infant and primary school. Every second or third adjoining village will have a high school, so the pupils need only cycle up to 5 km, on quiet roads to get to school. Each community has its own rifle range owned the by the army. Yet the most striking thing is the lack of urban sprawl. When the village stops, the farms start! Oh did I mention that the trains run on time?

We are generously met at the train station and Simon and Nadine assist with the luggage. After a sumptuous home-cooked BBQ of Swiss sausage and apricot chicken and salad, and a beer and some wine, the sun sets and it cools off rather quickly. Having planned the next day, we collapse in the bedroom that Fabian so kindly vacated for us.

Day 2

Up at 06:00, muesli, coffee, car by 06:15. Departed for the Seehorn (which translates as Lake Horn. Horn being the typical noun used for a Swiss Mountain.) We can see stars above the mountains as we drive in the glorious Alpine cool. On the way as the sun creeps into the valleys, all of the farms look "mowed" like an English football pitch, even on the slopes. Additionally there appear to be a lack of cattle for such pristine lawns. Then around the bend, there is some grass

harvesting equipment, that is like an oversized self-propelled lawn mower, but instead of being a mower, it's a hay cutter. There is a row of different "man-steered" equipment that allows the production of hay on slopes that would never support even a mini-tractor such as they use in glass houses. After about a 50 minute drive the sun is well and truly up, however with the height of the mountains, some places are still in shade, and there is snow to be seen on the peaks.

After a quick warm up in the car park, Simon issues us our walking sticks and we head out. We amble past the "original Swiss business" being a chalet in the Alps. It had a wooden date plate hung under the eaves marking the height of the snow in 1789! We can hear cow bells, they are the only sound that breaks the pristine silence, that is otherwise as crisp as the mountain air. The pasture is so amazingly green I need my sunglasses, then after the greenness of this place, the steepness of the bare rocked mountains that block the sun from warming us as the morning extends. I can feel at least a 10 degree temperature shift between the full sun areas and the shade.

Stage one is an undulating walk through paddocks, past cows.

Stage two is a narrow track on rock, surrounded by rock. Our host and guide has climbed this two years past, so ninety percent of his navigation is from memory. Finding the faded orange paint markers, with only the occasional glance at his GPS to cross check, "map to ground". He has an expert "Swissness" of a measured pace, that at a glance seems potentially over slow. I am however quietly confident that if required this pace could easily continue regardless of slope, or food, or water, for the next 96 hours without a break. He glides effortlessly over the oceans of rock that have seen us come, and will no doubt see us go.

Stage three, starts with the honorably misnamed "Hillary Step,"a small 1 meter drop that requires short Australians to slide and jump a little. The vegetation has changed to entirely Alpine plants, so this indicates we are above a certain height. One very narrow part where the track is one and a half times the width of my quad E boot; that has me strictly adhering to the three points of contact rule. Yes, both hands on the rock wall, only lift one foot a time. Only move one hand at a time. DON'T lift hand and foot at same time! The slide down would only be about 70m at this point, however the sudden stop at the bottom may require a stretcher and a rope to retrieve me. Caution builds confidence. Now we find lichen and plants clinging to a foothold (root hold?) between near microscopic cracks in the rock. Without seeing it, I would have thought this impossible. Then it happened.

Simon whispered excitedly that there was an Ibex sunbaking on an outcrop about 100 meters away. On closer inspection there were two billies, and a nanny. Then to our delight we noticed a group of four teenagers, head-butting and playing on a slope that was so steep it made me rethink my understanding of gravity as a universal truth. It clearly has a limited effect on Ibex! We sit and take in the vista, and the animals, have a drink and luxuriate in nature. These teenage Ibex frolic, ignoring us, content to practice the skills needed in adulthood. While two others climb the vertical face hunting green morsels, and a third, silhouetted against the brightening clear blue, reveals its head in profile.

Onward ever upwards, with Simon leading a clear path with a steady pace set to the slowest member of the party… me!

Herein lies the beauty of Alpine walking. Every time you pause in the ascent, and look around, the view has changed. It makes a mockery of cinematic photography limited by human

imagination and a wide angle lenses. Even a ten pace walk will change the view, sometimes, this shift offers a view around the corner, or over a ridge with breathtaking dramatic effect!

Audrey summitted first, chivalry and good manners being a Swiss trait. 2281M!. Impressively adding this to Mount Sinai on her list of non-technical summits. Simon, thoughtfully then provides chocolate. A must in replenishing the spent energy. We sign the book, enjoy the view and descend, pausing only to marvel at the Ibex, that now includes an infant and nanny and billie while the teenagers have reduced to three, they are still at their games.

The father all Ibex! This massive Billy European Ibex was sunning himself and luxuriating in the summer warmth after a cool night on the slopes of the Seehorn, Switzerland. Being easily 500 kg he effortlessly scratched his hide quarters with the massive parabolic horns he sports!

A restaurant between the pasture and the car park, that is part of a dairy, offers us cold mountain water, and from the menu a typical “herdsman's afternoon plate” of cold meat, cheese, and pickles all grown and manufactured on the farm, from the ground and the cows which we have been walking on and past.

Home via Interlaken, and shopping center for the essentials.

A swim in the River Aare requires a couple of kilometer walk up river, as it was flowing about 15 km per hour. At 10 meters deep, and about 75 wide, it's a rapid float/swim to the exit point and the perfect refreshment before sorting out the evening meal on what closes a glorious but typical Swiss Friday before we plan tomorrow's adventure!

Photo Credit : Please note, all photos have been taken by **Simon Kunzi** of Uttigen, Switzerland.

John M Knight is founding senior instructor at the University Skills Academy, and the digital marketing strategist for Tableland Gourmet Buffalo, both on line businesses based in Cairns, Far North Queensland, Australia.

With a background in Adult Learning, I.T., Process Engineering, Oil & Gas and Mining and Agriculture, John has a wide background from which he can cast a prism of insight over his travels.

He is happily married to his charming wife Audrey who shares his passions of travel, the circular economy and sustainable development as a means of transforming poverty to prosperity.

Part of this Body

Viola Lee

In my body I praise the body of
what comes what comes with long hours of heat
and sweat meshed within light working through loss
because so much will get lost throughout heat
what comes what comes together are bodies
these bodies in that longest heat and then
what comes arrives comes again somebody
these bodies still that understand that when
bodies will fight this way and remember
our way out from under and beneath and
next to the dark that dark channel chamber
valley of what is known even the end
we know where we are going we will just
continue continue age and then rust

tarnish fade
then become
begin become

Viola Lee was born and raised in Chicago, Illinois. She studied Poetry at Loyola University, Chicago and received her MFA from New York University. Her poem *City of Neighborhoods* was published in an anthology of Chicago poetry called City of the Big Shoulders which was published by the University of Iowa Press. Her manuscript Lightening after the Echo was published by Another New Calligraphy last year. She teaches 6-9 year olds at Near North Montessori School and lives in Chicago with her husband, her son and her daughter.

The Green Eyed Monster

Debu Mukerji

William Shakespeare (1564-1616) used the term *"green eyed monster"* to denote jealousy in his "*The Merchant of Venice"* and *"Othello"*. Jealousy is an emotion; the term generally refers to the thoughts or feelings of insecurity, fear, concern, and envy over relative lack of possessions, status or something of great personal value, particularly in reference to a competitor. Thus, it may consist of one or more of the emotions such as anger, resentment, inadequacy, helplessness or disgust. In its original meaning, *jealousy* is distinct from envy, though the two terms have popularly become synonymous in the English language, with *jealousy* now also taking on the definition originally used for envy alone. Jealousy has been observed in infants as young as five months.

Some claim that jealousy is seen in every culture. The Mahãbhãrata is one of the two great Sanskrit epics of ancient India, the other being the Rãmãyaṇa. The Mahãbhãrata with about 200,000 verses, original language *Sanskrit* presents an epic narrative of the *Bhagavad Gita*, *Kurukcetra War*, the *Dharma* and the life-stories of the Kaurava and the Pãṇḍava princes. The *Mahabharata* is a valuable humane epic. It showcases a lot of human emotions but perhaps the most intriguing is the one of jealousy.

When managed properly, jealousy is a very normal human emotion and one that grips all of us at some point in our lives. It is not a desirable trait, yet it does manifest itself at times in our actions and thoughts. In the Mahabharata, we see clearly about the two important yet diverse sets of feeling of jealousy. These two differ in the ways they manifest themselves. The first one, which is more obvious, is the one when Duryodhana displays openly for the Pandavas and the other is camouflaged one that Dhritrashtra (Duryodhana's father who was blind) manifests in his inner and outer feelings for the Pandavas. Duryodhana makes no bones about the fact that he is immensely jealous of the Pandavas and would do anything to harm them. The Pandavas are therefore aware of his jealousy and better prepared to handle it. Dhritrashtra's envy is however, cloaked in the garb of love and affection. This was less obvious to the Pandavas and hence more lethal. Dhritrashtra kept his jealousy alive aroused by Pandu's superseding him to the throne because of his blindness. That envy was later transferred to the sons of Pandu, rather the entire family of the Pandavas. After refusing to willingly give up his kingship to the Pandavas though he (Dhritrashtra) had ascended the throne as their caretaker when Pandu was away, he pretends to act fair. He gives half of the kingdom to the Pandavas but at an inhospitable part and the fertile part is retained by Dhritrashtra and therefore ultimately by Duryodhana.

Dhritrashtra also sanctioned the unfair game of dice, and Bhîma noticed the exhilaration on the king's face when Yudhishtir began losing the game. The blind king also misuses his position as an

uncle because he knows that Yudhishtir would not disobey him and came for the game of dice. Are you sensing the jealousy? As the king presiding over the court, he could have at least stopped the very unfair game and definitely the disrobing of Draupadi. He however was so eager to see the annihilation of the Pandavas that he remained a mute spectator. This kind of hidden envy or jealousy that the blind king felt for his nephews, the Pandavas continues in human emotions, and perhaps will remain so in history forever. Duryodhana's ambition and envy of the Pandavas was buttressed by the one that had lain dormant in Dhritrashtra. Duryodhana was unashamedly more direct and out in the open. Dhritrashtra however tried to act benevolent. Dhritrashtra therefore escaped being the target of the Pandavas, although his envy had fuelled the controversies. Thus the father-son duo of Dhritrashtra and Duryodhana show the same vices – pride, greed, anger, hatred and an excess of ego, all mix of jealousy that destroyed the entire clan that stood by them.

Jealous *Duryodhana* Plans to Kill *Pandavas*

After the death of Pandu, Bhishma, Dronacharya, and Vidura called a meeting to designate the next king, in place of Dhritarashtra who was in the throne in absence of Pandu as a caretaker. Two options were discussed. First, Yudhisthira being the eldest of the Kuru princes was considered for nomination. Second view, supported by Dhritarashtra and his brother-in-law Shakuni (brother of his wife queen Gandhari and maternal uncle of Duryodhana) was to select Duryodhana as the future king. But the opinion of Bhishma, Dronacharya, Kripacharya (Guru of the Royal House), and Vidura of nominating Yudhisthira as the heir-apparent prevailed. This naturally caused huge disappointment in Duryodhana's camp. Uncle Shakuni was well known for his villainous nature and cunning. He was displeased with the fact that his nephew Duryodhana was denied the chance to become the king. For this purpose in particular, he had come to stay at Hastinapur. He, therefore, lost no opportunity to humiliate and even to attempt to kill the Pandavas.

Soon the desired opportunity came to the evil minded Duryodhana and Shakuni to put an end to Pandavas. In nearby town of Varnavata, a grand exhibition used to be arranged every year. The organizers always sent an invitation to the King of Hastinapur to send some members of Royal Family to grace the occasion. This time, Duryodhana and Shakuni persuaded Dhritarashtra to send all Pandavas to Varnavata. The king agreed, and accordingly Pandavas were advised. Yudhisthira and the brothers were also happy to get the opportunity to mix with the people of their kingdom and get first hand information about their problems or wellbeing. Therefore, accompanied by their mother, Kunti and Draupodi the five, Pandavas decided to attend the exhibition at Varnavata.

Palace of Lac (highly inflammable material)

As was customary, the organizers decided to build a temporary palatial house for stay of the Royal family. The construction job was entrusted to one expert contractor whom Shakuni knew very well. Bribing the builder, Duryodhana and Shakuni deliberated a secret plan to put an end to the life of the Pandavas. It was decided the palace to house the Pandavas should be constructed out of highly inflammable material like Lac, resins, hemp, oil, fat, etc. The contractor completed his job very meticulously and it was not possible to detect any foul play from cursory outward examination of the house. Duryodhana and uncle Shakuni arranged to send their secret agent in guise of a servant who was instructed to put the house on fire when Pandavas would be fast asleep. Death due to burns would appear as an accident.

Thus plan was sure to succeed had the spies of Vidura, the Prime Minister and well wisher of Pandavas, had not informed Vidura of the plan. Vidura, on his part, alerted the Pandavas about the

'death trap' and a solution was offered in the form of digging an underground tunnel in advance to fool the Kauravas. The tunnel opened in the far off forest. The house was torched as planned and it was burnt to ashes within no time. Nevertheless, the great Pandavas had already left through the tunnel, but five workers and servants were charred to death. Everyone, including the Karna, took Pandavas to be dead. But with very valuable and timely guidance and help they were saved from the terrible wrath of Duryadhana's jealousy. Thanks to God and Vidura's wisdom. The humane epic of Mahabharata presents the complex human emotions vividly of this major event. Jealousy is wide spread and experienced by men and women of different cultures, across education, social levels or age groups and other denominations by which people are usually classified. But as seen in the attitudes of Dhritarashtra-Duryodhana, understanding the 'jealousy' is not always easy.

Jealousy: Shakespeare, Cervantes. Vidyasagar

Shakespeare (1564-1616) is said to be the greatest communicator in the English speaking world. He used the term *"green eyed monster"* to denote jealousy in his "The Merchant of Venice" and "Othello" and perhaps elsewhere. Othello vividly represents how the uncontrolled emotions such as bad-ego may results in terrible jealousy which can be one of the most corrupting and destructive of emotions. It is the jealousy and his innate sense of evil that prompted Iago to plot Othello's downfall. Jealousy is also the tool that Iago used to arouse Othello's passions including jealousy and rage. Only Desdemona and Cassio, the true innocents of the story, seem to be beyond the clutches of jealousy.

The Russian actor Konstanmtin Stanislavskias as Othello in 1896

From the very first scene of the play, Iago shows strong motives for his actions on his selfish interests. In this scene we see Othello, a general of Venice, has made Cassio his new lieutenant. Iago feels he truly deserves his promotion as he says "I know my price, I am worth more no worse a place." Iago is confused why Othello has made such a stupid decision. Iago is a man with a tremendous ego who sometime overestimates, his real worth. Roderigo, a Venetian gentleman, understands when Iago said that Othello is "affined to love the Moor." What Iago really means is "I follow him to serve my term upon him." Iago wants to use Othello for his personal gains. We also must put ourselves into Iago's shoes. He is a man who thinks his self-esteem and professional carrier have just been torn apart. Iago makes his plans and actions of revenge toward Othello, almost immediately by informing Brabantio, a Venetian senator and father of Desdemona, that "an old black ram (Othello) is tupping (his) white ewe (Desdemona)."

Iago is furious, feels he truly deserves his promotion as he says "I know my price; I am worth more no worse a place." Iago calls (and abuses) Othello a Moor and 'Barbary horse', referring to the famous horses of the Arab world, but also playing on the associations of 'barbarian' with paganism and savagery ego over here is confused about why Othello has made such a stupid decision. **Iago** also enjoys evil for evil's sake. He is one of the most villainous villains in all of Shakespeare. His next motive becomes clear when he convinces Othello "that he (Cassio) is too familiar (close) with his (Othello's) wife." Iago's evil motive here is to break the bondage between

Othello and Desdemona. Iago's chief desire was "disrupting Othello's peace and quiet". When Iago says "those things are still there, but yet confused," he is clearly watching the impact and admitting that he has some sort of plan of what he is doing on Othello even though the details are not worked out yet.

At about the same time as Shakespeare's, Cervantes' masterpiece, "*The Ingenious Hidalgo Don Quixote de la Mancha",* published in 1613, is the novel of Spanish romances of chivalry of knights and squires. This masterpiece is often recognized as the first novel of Western literature. One of Cervantes' characters, described being *'envious',* says: "I resent the fact that he calls me envious and then explain what envy is, as if I was some ignoramus (ignorant person); the truth is that of *the envy* I only know is the righteous, noble, and well meaning sort. I adore man's creativity and I admire his works…" This is not envy! It is said, in Greek mythology, the nymph Daphne fled from Apollo (the Sun) over the plains of Thessal, and the river Peneus, her father, turned her into a laurel bush to save her from him. Jealousy can manifest as anger, fear, hurt, betrayal, anxiety, agitation, sadness, paranoia, depression, loneliness, or even feeling inadequate. Furthermore, jealousy is mostly about fear, may be imaginary or egoistic self consciousness, otherwise real that our needs will not be met.

Managing Jealousy

Macquarie dictionary describes jealousy in several ways two of which are as follows:

1. Resentment against a successful rival or possessor of any coveted item.
2. Mental uneasiness from suspicion or fear of rivalry.

Conventional wisdom holds that jealousy is a necessary emotion because it can preserve precious social bonds, but if not regulated properly, jealousy may destroy relationships for instance it can give rise to domestic violence. The green-eyed monster, as Shakespeare called it, can take over our mind at any time during a relationship. What can we do to manage this emotion in a healthy way? There are good books, articles, courses available on managing jealousy. Some pointers from these sources include:

1. When one start feeling jealous, he/she should ask himself: Is it more fear-based or anger, greed or ego-based, and his unfulfilled expectations?
2. Reflect and share the feelings honestly to near and dear ones if possible.
3. Once you start gaining control, it may enable taking positive steps to sustain calm without the cloud of negative emotion that accompanies jealousy.
4. Change false beliefs if any. Beliefs are changeable. If you change your belief, you change the way you feel. Choose to tell yourself a belief that is nurturing and supportive, and you'll feel better.
5. Make a list of all your good points and only compare yourself to yourself rather than to others.
6. Work on your self-esteem. Raise your sense of self-worth and self confidence by acknowledging your accomplishments, inner qualities and other good things in you. One way to change your belief system and inner dialogue is to journal on daily basis supportive messages to you. In time, your efforts will begin to sink into your subconscious. And as a result, you'll develop new inner strengths, diminish unnecessary envious feelings, and feel more joy within and in life.

7. Last but not the least – reflect on your situation carefully and with noble thoughts.

The lesson: to improve the situation, unmask, your green-eyed monster before it is too late!

Green-eyed Monster Jealousy from
The Amazing World of Gumball
Courtesy of Wikipedia

Go on your own or if you can trust someone to share your true joy, fear, anomalies in life and misunderstandings and so on, it may help in finding ways to the true source of joy. We may use two quotes as examples:

- *"I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy"- Rabindranath Tagore; and*
- *"There is only one thing which either helps or hinders, it is the application of our ideal in our life" - Swami Paramananda (1977).*

Debu Mukerji (debumukerji@bigpond.com): Debu is an independent Social Science and Engineering Management Researcher/Consultant with long academic background at the UNSW Sydney. He was with SIEMENS Bombay before migration to Australia. He has international project management expertise; current focus: learning-education, project management practitioners' professional and personal-self development underpinned by spiritualization for sustainability.

Herland by Charlotte Perkins Gilman : A Book Review

Jill Charles

Imagine a country without men. Would it be free from war and rape? Would medicine and science suffer without male doctors and inventors? How long would it take for women to fill all professions: engineering, law enforcement, the military, agriculture and the clergy? Would the women only country be a peaceful, equitable sisterhood or a strict oligarchy lacking romance, fun and future generations?

In 1915, American author Charlotte Perkins Gilman wrote Herland, a science fiction utopia with three male explorers discovering an all-female country, hidden in the mountains on an unnamed continent. Scientist Van, Southern gentleman Jeff and rich playboy Terry fly in with their airplane to find a country with bountiful gardens, electric cars, goddess temples and neat pink houses. Expecting to flirt with young beauties, Terry feels shocked to meet the white-haired grandmothers who govern and defend Herland. Jeff admires the capable women, especially gentle Celis. Scientist Van befriends brilliant Ellador who introduces the men to her country's language, culture and history. Van learns how Herland lost all its males and the strange miracle that allows women to give birth without partners and only when they choose to become mothers. The girl children of Herland are cared for by all their neighbors as well as their birth mothers, roaming freely from one house to another and learning lessons outside with an independent study method "like that of Signora Montessori in Italy." In this country, women and children are free. Van notes that "Every girl I talked to, at any age above babyhood, had her cheerful determination as to what she was going to be when she grew up."

Like Victorian writer Jules Verne imagined submarine travel, Charlotte Perkins Gilman correctly predicted many changes in women's lives from 1915 to 2017. The women of Herland work outside the home, choose their professions, vote, govern and protect themselves. They wear short hair, pants and jackets or flowing robes, without binding corsets or pinching high-heeled shoes.

The Herlanders study the men, eager to learn from them and introduce them to their countrywomen. They dream of the world of two sexes beyond their mountain haven, but also fear the war and gender determinism there. Ellador says "Motherhood is venerated in your world as it is in Herland, but with you it is used to confine women and children, not help them grow."

Charlotte Perkins Gilman showed more wit, insight and optimism for the future in Herland than I ever expected. After reading her famous short story *The Yellow Wallpaper* about a depressed new mother isolated at home by her physician husband, it is refreshing to read Herland. I also learned how Gilman left her first marriage, supported herself and her daughter as an author and feminist lecturer with books like Women and Economics (1898) and her own newspaper *The Forerunner*, where she published Herland as a serial story. Gilman remarried, living happily with her mother, daughter and second husband and writing all her life.

I was taken aback by Gilman's total faith in eugenics. The mothers in Herland "made a new kind of people and made them well" but the overmothers who rule decide who is fit to breed.

Women with physical defects, criminal tendencies or mental illness are not allowed to become mothers. In 1915, Gilman could not have guessed how the United States would forcibly sterilize women in prisons and insane asylums, especially black women, Latina women and welfare recipients, starting in the 1920s. She could not have known how eugenics would be exploited in Nazi Germany to murder Jews, homosexuals, Roma and citizens with Down syndrome and other disabilities.

Herland has no idea of homosexuality and is ambivalent about race and ethnicity. One line describes all Herlanders with "these women were white" while physical descriptions of Ellador depict her nut-brown skin, black eyes and curly dark hair. The location is never hinted at; Herlanders could be Amazons in Greece or Brazil or Africa or Asia.

Despite these limitations, I would recommend Herland to readers of any gender for all the questions it raises about how much of femininity and masculinity is learned cultural behavior and how much is natural, about women's roles in families and professions, in religion, science and culture. Herland's optimism for a world that honors individuals of all genders and ages is greatly needed today. Forward-thinking authors like Gilman can enlighten us in our own hopes and plans for the future.

Jill Charles grew up in Spokane, Washington and majored in Creative Writing at Seattle University. In 2007 she moved to Chicago where she writes poetry and fiction and lives in the Albany Park neighborhood. Her career includes nonprofit, academic and legal office work. Jill is co-editor of Batayan, a bilingual literary magazine in Bengali and English. She performs her poetry at open mic nights at The Heartland Café and Royal Coffee. Jill is one of the Chicago Writing Alliance workshop facilitators at Bezazian Library in Uptown. Read her jazz age novel, Marlene's Piano, available from Booklocker.com.

Home, More or Less

Kathy Powers

I have my own apartment until the end of December, then I will be homeless, i.e., without permanent shelter.

Psychologically, I am already homeless. My son doesn't want me in his life, my cousins have full lives in which I have no room, and my cats are my only connection to order and responsibility that I have left.

I applied years ago to two senior centers. I have not heard word one from either of them. I guess they don't want me either. All I want is a place to safe place to stay with my cats that I can afford on my social security income.

I don't have that now where I reside. I pay 70% of my social security income in rent. The front door of my apartment building, perpetually open, does not bother the landlord. I have had broken windows in my unit since 2011 when I moved in. I reported them. They are not fixed. The landlord does not seem to care, although the City of Chicago cited him two years ago for this. Mold and moisture invade my walls. I breathe toxic air daily.

I don't think about these things. When I say, "I'm going home," I mean that place where my cats greet me in my apartment. My cats make me comfortable, they are the special part that make me feel at home.

My psychiatrist does not understand how important my cats are to my bipolar recovery. My therapist of over 40 years does. Apartments do not like pets. My cats are not pets. They are my guarantee of my sanity. They are my service and emotional support animals.

Sandusty and Treasure love me and I love them, unconditionally. This is what makes wherever I land with them an assurance of home. We share a communal schedule that I rarely break. Together we are warm and cozy. Home is a place where we live together.

I am so worried that I won't be able to take them with me. I am not afraid of much, but this threatens my ability to look for forward to a place to live. I would rather die!

Kathy Powers — I am a civil rights activist who developed my passions from coping with bipolar disorder symptoms. I have a tagline: "Advocacy is my therapy." Through advocacy I have discovered truth and beauty in helping people and sharing art.

The old boy got to thinkin' . . .

Larry Ambrose

Me 'n her We been hitched
More'n fifty years Next month.
Never much thought about it.

Yeah, got to thinkin' No reason Just did.
Felt kinda dumb at first Writin' it down here.
What if somebody gits ahold of it?

What if SHE sees it? Calls me silly?
Worse yet, Asks what took so long?
Aw, she knows I love 'er No need to say it.

Shouldn't have to Things been good.
I always say please an' thank you,
Never find fault Any more.

Ought to say it sometime though.
Naahh, She'd just laugh.
Too risky. Leave it alone.

Larry Ambrose is the author of four books on the subject of mentoring. Long an amateur artist and carver, as a writer, he has recently graduated from essays to poetry. Larry has been a member of various writing groups, most significantly the Chicago Writing Alliance. He has previously been published in *Batayan*.

All Things Must Pass

Daniel Staub Weinberg

Daniel Staub Weinberg is a Jewish Outsider word artist from Chicago who makes political and social drawings with pen and ink. He has been doing this for 5 years. View more of his work on https://www.artpal.com/weinbergsart

A Collection of Birds

By the Photographers of Uchhas, an outdoor enthusiasts' club

There are song birds but among the Warblers, Prothonotary is the King of Warblers. His song is unparalleled. Here he sang his heart out in 2017 at Magee Marsh, Oak Harbor, Ohio just outside of Toledo,. Captured by Shreeni Rao.

I will never give up longing.
I will let my hair stay long.
The rain proclaims these trees,
the trees tell of the sun.
Let birds, let birds.
Let leaf be passion.
Let jaw, let teeth, let tongue be
between us. Let joy.

–from "Let Birds" by Linda Gregg

Rufous-collared Sparrow at the Perito Moreno glacier, Argentina. The sparrows are very tolerant to human presence and they often hop on open ground as they forage for seeds. Captured by Sonu Sam Varghese while backpacking in Patagonia in November 2008.

Scarlet Macaws are native to Central and South America. They are very colorful, intelligent and social creatures with distinct likes and dislikes, but can be noisy at times. The scarlet is a "sassy" bird, filled with energy and personality. Captured by Saumen Chattopadhyay in Sarasota, Florida in July 2009.

Photo Gallery

Atanu Biswas

I am a scientist by profession who came to the USA from Kolkata in 1980 for my Ph.D. in Chemistry from University of Notre Dame, South Bend, Indiana, USA. However, more people know me as the face of Biswas Records, which I founded in 1994 in USA at a time when the CD industry was at its infancy and none or a handful Bengali CDs were available even in Bengal.

From 1993 to 2005 Biswas Records produced around 175 Bengali and North Indian classical compact disc (CD) titles by eminent performers like Rezwana Choudhury Bannya (12 CDs), Ramkumar Chattopadhyay (10 CDs), Suman Chatterjee (2 CDs), Swagatalakshmi Dasgupta, Purba Dam, Subinoy Roy, Durbadal Chatterjee, Kirtan Geetasri Chhabi Bandyopadhyay (2 CDs), lokgeeti singers Utpalendu Chowdhury, Swapan Bose, Amar Pal, Prahlad Brahmachari), Ustad Rashid Khan (4 CDs), Ustad Shahid Parvez (3 CDs), Pandit Ajoy Chakrabarty (3 CDs), Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Jasraj and by many other famous singers. Biswas-label CDs and DVDs were once available through online US retailers Amazon, Barnes & Noble, Border Books, Sam Goody and Tower Records.

What Biswas Records has done to propagate Bengali music in North America is unprecedented. In the history of Bengali music nobody, outside India has been so effective in spreading Bengali music abroad. We gratefully remember that it was all possible only with valuable support from Bengalis and music lovers of USA, Canada and other nonresident Indians.

In recognition of Biswas Record's contribution to Bengali music, the North American Bengali Conference (NABC) twice awarded Dr. Atanu Biswas its highest award at San Francisco Bay Area (1999) and at Detroit (2007) along with actor Prosenjit Chatterjee, director late Rituparno Ghosh, Sandhya Roy, actor Sandhya Roy etc.

Though my science occupation scientist financially supported my family and paid the bills, I always enjoy arts and music. My appreciation for arts helped me in providing input to the design and development over 175 CD covers which I produced. Since CDs and DVDs are outdated, I am embracing photography as my hobby and constantly aiming to develop my photographic skills. Welcome to these three nature photographs, which I took while visiting Brazil. Thank you.

Catching fish from the pier at Fortaleza. Fortaleza is a very popular tourist destination in Northeast Brazil because of its many beaches with year around warm temperature between 70 to 86F. The Northeast Brazil has perhaps the most stunning coastline in South America.

Moss stones of Atlantic Ocean at Jericoacoara, Brazil. Jericoacoara is a small fishing village of Northeast Brazil; it is mecca of windsurfing and kite surfing.

Blue sky above me, white sand below me, fire within me. You'll leave roads and the hustle of civilization far behind when you visit Jericoacoara, Brazil. It boasts of vibrant blue and white sky with yellow and white sand. Until about 20 years ago, Jericoacoara was still a secluded and simple fishing village. There were no roads, no electricity, no phones, no TV's, no newspapers, and money was rarely used.

মনের বাতায়নে বসে

সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

মনের বাতায়নে বসে চোখ মেললাম
খুঁজলাম আমাকে
কে আমি ?
আলোড়ন হলো গভীর সত্তায় . . .
কবি বললেন –
''আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে ।''

স্থান, কাল, পাত্র – এই নিয়ে মাত্র
জগৎ আছে ।
মন আছে, তাই কি সব আছে ?
দার্শনিক বললেন – ''I think therefore I am.''
আমি ভাবি তাই আমি আছি ।
সত্য আমার সত্তার কাছাকাছি ।

আমি দ্রষ্টা ।
মনস্তাত্ত্বিক বললেন ''The Observer is the Observed''
যে দেখছে সে আমি, যা দেখছি সেটাও আমি ।
দর্শন বলল ''সবই মায়া ।''
তিনিই সত্য মিথ্যা কায়া ।

বিজ্ঞান ভাবলো . . .
ইলেকট্রন আছে আবার নেই ।
সবই তরঙ্গ আবার সবই কণা –
জানার মধ্যে সবই অজানা ।

বিজ্ঞানী বললেন ''everything is vibration''
সৃষ্টির সমগ্রে কম্পন ।
পরমানু বিদ্যার বই খুলে দেখি
সবের মধ্যে কিছুই নেই
আর সবকিছু আছে এই ফাঁকাতেই ।

শেষের মুহূর্তে কবির বাণী কানে বাজলো –
''মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস !
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো ।''
তখন পান্নার গভীরে সবুজের লেশ মাত্র নেই, চুনির বিলাসিতা ম্লান ।
চাপা হেসে বললাম
''দিবা স্বপ্নে সবাই বাঁধা
আমি কে সেটাই ধাঁধাঁ ।''

মনের বাতায়নের সময় স্থির
বাতাস ধীর ও নয়, চঞ্চল ও নয় ।
সামনের রাস্তা শুরুতেই শেষ, শেষেই শুরু
আমি কে ? কোথায় আমি ?
তুমি বললে –
''আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব ।''
কে তুমি ? প্রতিধ্বনি হলো ''আমি'' ।
তুমি আবার বললে –
যদি আমাকে জানতে চাও, তোমার খোঁজ নাও
মনে মনে দাও ।''

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science, Native American flute and Indian classical music. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago with his wife, Ranjita, and his daughter, Suranjana is a Junior in UW Madison.

ভোরের স্বপ্ন

সুজয় দত্ত

আজ ভোরবেলা পৃথিবীর পথে হাঁটতে বেরিয়ে দেখি
লাগছে অচেনা চারিদিক, সব বদলে গিয়েছে এ কী !
ডাকছে না পাখী, জ্বলছে না বাতি, নেই ফুল কোনো গাছে --
পথের দুধারে রাশি রাশি শুধু কবিতা ঘুমিয়ে আছে ।

এদেরই কেউ জেগে উঠে হবে বোবা ভিখারীর ভাষা,
ফুটপাথবাসী অনাথ শিশুর কুঁড়িতেই ঝরা আশা ।
এদেরই কেউ ঘুম ভেঙে হবে শোষিতের প্রতিবাদ,
নিঃসম্বল বাস্তুহারার করুণ আর্তনাদ ।

এদেরই কেউ জেগে উঠে হবে মেঠো বাউলের গান,
মেঘনার বুকে ভাটিয়ালি হয়ে জুড়াবে মাঝির প্রাণ ।
এদেরই কেউ জ্যোৎস্না-নিশীথে প্রেমিকের সংলাপ,
কিংবা মিছিলে দৃপ্ত স্লোগান -- বিপ্লবে রাখে ছাপ ।

এদেরই কেউ পূজারীর মুখে দেবতার অঞ্জলি,
বৈদিক যুগে ঋষির কণ্ঠে সূক্তিরত্নাবলী ।
রামায়ণ আর মহাভারতের পুণ্যকাহিনী থেকে
মেঘদূত হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে বিরহী কবির বুকে ।

এমনি করেই যুগসঞ্চিত সুপ্তির থেকে উঠে
বারে বারে এরা পাল্টাবে এই পৃথিবীর মুখছবি ।
এরাই আবার চুপিচুপি এসে প্রজাপতি-পাখা মেলে
কল্পনা-রঙে রাঙাবে হৃদয় -- সার্থক হবে কবি ।

সুজয় দত্ত — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

অমৃতস্য

সুজয় দত্ত

জীবন-সমুদ্রের দ্বীপগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে জীবনের মানে খুঁজে যাই
মাঝে মাঝে ডুব দিই চেতনার অতলেতে – মুক্তা-ঝিনুক যদি পাই
আকাশেও পাখা মেলে কখনো-সখনো উড়ি, শূন্য পেরিয়ে মহাশূন্যে
যখন মাটিতে থাকি শুধুই মানুষ দেখি, হিসেব রাখিনা পাপপুণ্যে
ফেলে আসা জীবনের ছায়াছায়া কত ব্যথা মরীচিকা হয়ে পিছু ডাকে
মগ্ন দুচোখ তবু মানেনা সে-পিছুটান, স্বপ্নবিভোর হয়ে থাকে
কুলায়ে ফেরেনি পাখী, পথ চেয়ে বসে থাকি, আসবে কখন সাঁঝবেলা
গোধূলি-আলোয় মাখা স্মৃতি শুধু রবে রাখা, শেষ হবে লুকোচুরি খেলা

তখন আমায় দেখো সে চির-আলোয় তুমি, হয়তো লাগবে আধো-চেনা
দুজনের কত প্রীতি, কত কথা, কত গীতি – কোনো তার চিহ্ন রবেনা
নিমেষে ফুরিয়ে যাওয়া হৃদয়ের চাওয়াপাওয়া কালের পরশে হবে ফিকে
তুমি আর আমি মিলে জীবনপ্রবাহ এক বয়ে যাব অমৃতের দিকে ।

কবিতা

শিশু দিবস

সুদীপ নাথ

দৃষ্টি কমে গেছে, চারিদিক কুয়াশা, সন্ধ্যা নেমে আসে ঘড়ি ধরে ।
তবু ইভনিং ওয়াকে যায় বুড়োটা, রোজ হেঁটে শৈশব থেকে বাড়ি ফেরে ।
চায়ের দোকানের নাবালক ছেলেটা শুধু সিনেমার পোস্টার দেখে ।
সে কি আর জানে শিশু শ্রম নিয়ে মানুষ আজকাল কত কি লেখে ?
বুড়োটা চায়ের দোকানে এসে বসে, চা চলকে পড়ে বাসি কাগজে ।
রাজনীতি নয়, আজ শুধু শ্রমহীন শৈশব ছেয়ে আছে তার মগজে ।
নিরক্ষর ছেলেটা শিস দিয়ে যাচ্ছে দুহাতে চায়ের কাপ সামলে ।
শৈশবের বুড়োটা বলে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটা ডাবল ডিমের ওমলেট ।

প্রেমিক

সুদীপ নাথ

ডুবে যেতে যেতে খড়কুটো পাবে জানি
চলে যেতে যেতে ফিরে আসে অভিমানী
ঘৃণার আগুন নিভে যায় আজ ও জলে
প্রেমিক জানে না সে কখন কার দলে
উড়ে যেতে যেতে বলেছিল শুকপাখি
পাহাড় পেরিয়ে ভালবাসা আছে নাকি
চেঁচিয়ে উঠেছে সমগ্র বনভূমি
সে অহং পাহাড় নিজে তুমি শুধু তুমি আর তুমি

নীললোহিত

সুদীপ নাথ

একটা প্রেমের গল্প তোমায় শোনাতে চাই নীললোহিত
উদাস মুখে শুনবে তুমি, আমিই হবো সম্মোহিত
সকাল থেকে দিক হারিয়ে ঠিক পৌঁছে যাব দুপ্পুরে
শূন্যপুরে একলা তুমি ? নাকি সঙ্গে থাকে মার্গারেট ?
আমার অনেক প্রশ্ন আছে শুধু তুমিই জানো উত্তর
আকাশ সেথা কেমন নীল ? আর বড়ই বা তা কত্ত ?
এখানে আকাশ ভাগ হয়ে যায়, রক্ত ধোয়ায় বৃষ্টি
মেঘলা আকাশ মন ঢেকে দেয়, রোদ ওঠে না মিষ্টি
বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকি, কই ? আসে না আর নীরাদি
তোমার মতই নিরুদ্দেশ, স্বপ্নেই থাকো রাত্রি দিন

পেশায় সফট্ওয়ার ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় লেখক । কলেজে কবিতা লেখার দিন ছেড়ে আসার পর পাঁচ বছর আগে হঠাৎ করে লেখনী আবার চলতে শুরু করেছে । যেন এত দিন মনে মনে লেখা হত, আজকাল শব্দগুলো কীবোর্ডের ছোঁয়া পাচ্ছে । কবিতার বই 'নির্বাসিত কবিতা' প্রকাশিত হয়েছে । কবিতা আর গল্প – দুটোই লিখি । সময় পেলে জলরঙে ছবিও আঁকি । সময় না পাওয়ার ব্যস্ততা এবং আলসেমীর পাহাড় পেরিয়ে নতুন কিছু লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি ।

ফটিকের পুজো

আনন্দ সেন

সকাল থেকে আকাশটা মরা মাছের চোখ হয়ে আছে
পাড়ার কোন দোকান আজ ঝাঁপ খোলেনি
কুকুরগুলো ঝিমিয়ে পায়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে
সারি সারি সাদা জামা, নীল প্যান্টে স্কুলের উঠোন ভরে উঠছেনা আজ
সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে
কখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে ।

ফটিক টিউবওয়েলের জলে স্নান সেরে
বগল ফুটো শার্ট পরে পার্কের দিকে এগোয় ।
এবার শতদলের পুজোর আশি ফুট ঠাকুর
লোক ভেঙ্গে পড়বে ।
এই সময়টার জন্য ফটিক মুখিয়ে থাকে ।
লোকের ভিড়ে যখন লোকে হারিয়ে যায় ।
সারা পার্ক তখন সোনার খনি ।
ঘড়ি, মানিব্যাগ, সেলফোন, একটা সানগ্লাস –
আরও কত কি
ফটিক কুড়োয় . . . . .
ফটিকের সাথে কুড়োয়
মানিক, পল্টু, আরও কিছু ছেলেবেলা
কে পারে তার ঝুলি কতটা ভরতে ।

পুজোর সময় ফটিকের পেট ও ভর্তি থাকে ।
সপ্তমীর দিন দুপুর বেলা একটা ছেলে
তার আধখাওয়া ঘুগনির বাটিটা দেয় ।
আর রাত্তিরে চিকেন রোল,
টাটা সুমোর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা
একটা হাঁস ফর্সা হাতের আগায় ধরা
সে হাতের সাথে একটা মুখও ছিল
তবে সেদিকে তাকায়নি ফটিক

অষ্টমীর দিন মানিক এসে খবর দেয়
পাশের পাড়ার কাঙ্গালী ভোজন হচ্ছে

ফটিক কবজি ডুবিয়ে খায়
লাবড়ার সুগন্ধ সারাদিন নাকে লেগে থাকে ।

নবমীর দিন ঠাকুর দেখে বেড়ায় ফটিক, মানিক আর পলটু ।
কি দারুণ সব ঠাকুর
কোথাও ঠাকুর একচালা
কোথাও ঠাকুরের মাথা আকাশ ছোঁয়
কোথাও ঠাকুরের মুখ পাড়ার নতুন বৌ
আবার কোথাও ঠাকুর মালালা ।
ইনি কোন মাতা অবশ্য ফটিক জানে না ।
ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে ফটিক
মন্ডপ থেকে মন্ডপে
প্যান্ডেল থেকে প্যান্ডেলে
কোথাও ঝুলন্ত বাগান
কোথাও ভ্যাটিকান
ইগ্লু থেকে পিরামিড
প্যাগোডা থেকে স্পেস স্টেশন
দেখে দেখে যখন পা আর চলে না
গলা শুকিয়ে কাঠ

ঠিক তখন

পাঁচতলা মন্ডপের ঔদ্ধত্য তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে
হাজার হাজার লোকের ভিড়কে অগ্রাহ্য করে
গন গনে গরমের মুখে লাথি মেরে
মেঘের বুক ছিঁড়ে বৃষ্টি নামে ।
সারা শহর ভাসতে থাকে
ঢাকা পড়ে যায় জলের মাদুরে ।
ঘরবাড়ি, রাস্তা, গাছপালার সাথে
ধুয়ে যেতে যেতে

ফটিকের খালি একটা কথাই মনে হয় –
অত ঘুগনি খাবে কে ?
দশমীতে আবার রোদ ওঠে
আবার পথে নামে মানুষ
আগের দিনের না পাবার দুঃখ উসুল করে নিতে চায়
শেষ বারের মত ।

ফটিক আজ সকাল থেকে খুব ব্যস্ত
পাড়ার মন্ডপে আরতির কাজে হাত লাগায়
ধুনুচি নাচের রশদ জোগাড় করে দেয়
মিষ্টি বিতরণ করে সিঁদুর খেলার পরে
লরিতে ঠাকুর তোলে ।

আজ ফটিক পুজোয় মাতে ।

ভাসানে যাওয়া হয় না ফটিকের
লরিতে জায়গা হয় নি ।
সারাদিনের ধকলের পর ক্লান্তিতে শরীর অবশ হয়ে আসে
ভাঙা মন্ডপ থেকে বস্তির ঘরের দিকে চলতে চলতে
পেটের মধ্যে উদ্যত আগুনে খিদেটাকে থাবা মেরে]
ফটিক মনে মনে বলে
– আসছে বছর আবার হবে ।

Ananda Sen is a Professor of Biostatistics at University of Michigan. Ananda also passionately pursues the hobby of acting whenever he can. When feeling stressed, he takes recourse to the Abrho keyboard on his desktop and types up Bengali poems. He is a regular contributor to Batayan. Ananda lives in Ann Arbor, Michigan with his wife and two kids.

ঘুম

ধীমান চক্রবর্তী

কখনও দু'চোখে স্থির নীহারিকা
কখনও সুনামি
কখনও ঘুম

হয় তো আবার বহুদিন পরে
হয় তো শান্তি
হয় তো ঘুম

যদি সন্দেহ মাথা কুরে খায়
যদি স্মৃতিপথ ঢাকে কুয়াশায়
চলা শেষ হ'লে ভুল ঠিকানায়
রাত নিঝুম

শরীর যখন শিথিল, কাতর
বুক হিমবাহ, দুই পা পাথর
তখন হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ,
পাড়িও ঘুম ।

লা ফাম ফাতাল

(la femme fatale = the deadly woman)

ধীমান চক্রবর্তী

মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে
বুকের মধ্যে দমাদ্দম
কুং ফু, জুডো, আর কারাটে
ঝাড়ছ ক'ষে, আমার যম !

পায়ের নীচে হাঙর, কুমির –
ঝুলছি বাতাস খামচে,
চিন্তা জুড়ে ঘুরছ তুমি,
দুই চোখে ঘুম নামছে ।

তোমার কিন্তু ঘুম-ভাঙা চোখ
কফির কাপে নিবদ্ধ –
তাল সামলে সালসা নাচো,
হাসির জলে বিপদ ধোও ।

কি মোহময় নকশাখানি –
জাল বুনেছে পাঁচকোণা !
জড়িয়ে মরছি, তবুও জানি,
তোমায় ছাড়া বাঁচব না ।

ধীমান চক্রবর্তী – জন্ম : ১৯৬৬ কলকাতা । বাল্য দিল্লিতে, কৈশোর কলকাতায়, প্রথম যৌবনের অধিকাংশ মুম্বাই-তে অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে প্রবাসী - প্রধানত এবং বর্তমানে মার্কিন মুলুকে, কিছুটা সময় জার্মানি এবং ফ্রান্স-এও । পেশায় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও গবেষক । কাজের বাইরে সর্বঘটে কাঠালি কলা । নেশা : চা, ঘুম, কলকাতা ।

কবিতা

লিমেরিক

শুভ্র দত্ত

সক্রেটিসের স্বভাবটা ওই, সবেতে বাঁধাবে ক্যাচাল ও
সোজা জিনিসটা ধরে করে ব্যাঁকাটাকে আরো প্যাঁচালো
নানান প্রশ্ন একে তাকে ধরে
তা'পরে দাঁড়িয়ে রাস্তার মোড়ে
'জানিয়াছি আমি জানিনা কিছুই' এই বলে শেষে চ্যাঁচালো ।

আর্কিমিদিস সমস্যাটায় গেছিলো প্রায় ফেঁসে
মাথায় এলো তার সমাধান স্নান-গামলায় ভেসে
লাফিয়ে পড়ে ছিটিয়ে জলে
'ইউরেকা' সে চেঁচিয়ে বলে
রাস্তা দিয়ে দৌড়ে চলে জন্মদিনের বেশে ।

পিথাগোরাস সে নিজে বাড়ির জমিটা মাপতে নেমে
দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতা নিয়ে যাচ্ছিল নেয়ে ঘেমে
সকাল-দুপুর-বিকেল খেটে সে
সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে, শেষে
নামালো সেটার সমাধান এক জব্বর থিওরেমে ।

আপেল গাছের তলায় যখন বসলো গিয়ে নিউটন,
টোটাল কেওস, হঠাৎ টাকে উঠলো করে ঝনঝন ।
ফলের গুঁতোয় গুলিয়ে মাথা
ভরিয়ে ল্যাব রিপোর্ট খাতা
লিখলো ভরে একশো পাতা, বিষয় গ্র্যাভি-টেনশন ।

গ্যালেলিও ছিল মেডিক্যাল স্কুলে, পাল্‌স্‌টা মাপতো ভালো
গির্জার উঁচু সিলিং-এ ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠন আলো
দুলছে হাওয়ায় এদিক-ওদিকে
নাড়ি ধরে মেপে সেটার গতিকে
ধর্মচর্চা ভুলে তা নিয়েই সময়টা কে কাটালো ।

শুভ্র দত্ত — সিয়াটেলের বাসিন্দা, পেশায় রোবটিক্স প্রযুক্তিবিদ, আর নেশায় লিমেরিকবি, অর্থাৎ লিমেরিক লেখেন এমন কবি।

তার চেয়ে একটু বিশদে বলতে গেলে — শুভ্র দত্ত আদতে কলকাতার ছেলে, পরে সিয়াটেল শহরের প্রায় তিন-দশকের বাসিন্দা। নানা সময়ে নানারকম পেশায় পা গলিয়েছেন — মহাকাশ বিজ্ঞান, ক্যামেরার ব্যবসা, বায়োমেডিকাল প্রযুক্তি, রোবটিক্স, ইত্যাদি প্রভৃতি। নেশাও নানান ধরণের; তার মধ্যে আছে ছবি তোলা, বাংলা বই পড়া, যন্ত্রপাতি তৈরী করা, ওয়েবসাইট বানানো, এবং অনর্থক অর্থহীন লিমেরিক লেখা। বাংলিমেরিক ডট কম (BangLimeric.com) ওয়েবসাইট ওনারই সৃষ্টি।

দেয়াল

মৌসুমী ব্যানার্জী

একটা দেয়াল
শক্তপোক্ত, মজবুত ।
রঙবেরঙের পাখিরা উড়ে এসে বসতো
তার
কাঁধে
পিঠে
মাথায় ।
কেউ নিয়ে আসতো ঠোঁটে করে
বটগাছের একটুকরো ঝুরি,
কেউ শালুকপাতা,
কেউ বা রক্তবর্ণ কুর্চি ফল ।
দেয়াল তাদের আপ্যায়ন করতো
— এসো, বসো, গল্প কর, খাও
ও পাখি, তার পরে উড়ে যাও ।
'যাই গো' বলে উড়ে যেতো পাখিরা,
'আসব আবার,
যেদিন ফুল-টুল ফুটবে
চাঁদ-টাঁদ উঠবে
ভালো থেকো, মজবুত থেকো, যাই . . . ।'

পাখিরা চলে গেলে
দেয়াল আবার আগের মতো
শক্তপোক্ত, মজবুত ।
মাঝে মধ্যে সুরকি খসে তার,
ইঁটের গায়ে শেকড় গজায়,
কিন্তু দেয়াল আগের মতই
মোটামুটি শক্তপোক্ত, মজবুত ।

একদিন এল এক হাক্লান্ত ফিঙে
তার না আছে ছিরি, না আছে ছাঁদ ।
ঠোঁটে এনেছে শুধু এক ফোঁটা বৃষ্টির জল ।

দেয়াল বলে
এসো, বসো, বিশ্রাম নাও ।
ফিঙে চওড়া শক্তপোক্ত দেয়ালের
এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত উড়ে যায় ।
কাঁধ, পিঠ, মাথা সব এড়িয়ে
গিয়ে বসে
সেই ছোট্ট একফালি গর্তে
— যেখানে সুরকি খসছিলো দেয়ালের
প্রতিদিন, প্রতিরাত
একা, একা
অল্প, অল্প ।
দেয়াল মনে মনে রাগ করে, বিরক্ত হয়
শক্তপোক্ত মজবুত প্রান্তর ছেড়ে
শেষে কি না সুরকি খসা গর্তে ?
আজ না হলেও কাল
ফিঙে নিশ্চয়ই বসবে পুবের কোণে,
যেখানে সকালের রোদ খেলা করে
রক্তকরবীর ডালাটা'র সঙ্গে !

দিন যায়, মাস যায়
— দেয়াল আর ফিঙের অসম বন্ধুতা
গড়িয়ে গড়িয়ে নদী হয় ।
ফিঙে বেলা অবেলায়
খেলা করে আসে
দেয়ালের পুব কোণে
একফালি রোদ আর রক্তকরবীর সঙ্গে ।
তারপর হাক্লান্ত ফিরে আসে
পশ্চিমের সেই সুরকি খসা
নিভৃত গর্তে ।
ঠোঁটে এক ফোঁটা জল
তুলে আনা সেই নদী থেকে
— যে নদী
দেয়ালের বুক চিরে তৈরি হচ্ছে
প্রতিদিন ।

সপ্তাহ, মাস, বছর পার করে
সুরকি খসে
নদী চওড়া হয়
গর্ত বাড়ে ।

দেয়াল বলে
আর নয়
আমার সোনালি চত্বরে এসো ফিঙে ।
সেখানে বাস করো
আরামে
আনন্দে
খুশিতে ।
এই সুরকি খসা ভগ্ন বুক বুজিয়ে
আবার আমি
মজবুত, শক্তপোক্ত হব ।

ফিঙে অপলক ভাবে
ঠোঁটে এক ফোঁটা নদীর জল
যে নদী দেয়ালের বুক চিরে
তৈরি হয়েছিল প্রতিদিন ।
'দেয়াল, তোমাতেই যে অনন্তকাল বসবাসের ইচ্ছে
তোমার মজবুত, ভগ্ন
সবটুকু প্রান্তর জুড়ে ।
তোমার আলো, আঁধার
সবখানি নিয়ে ।'

সকালের রোদ যখন
রক্তকরবীর ডালটা'র সঙ্গে
খেলা করছে
তখন দেখা গেল
— দেয়ালের সুরকি খসা গর্তে
টইটুম্বুর নদীর জল
ফিঙের ঠোঁটে
ফোঁটায় ফোঁটায় আনা,
তাতে শুধু
একটি মাত্র কদমফুল !

Dr. Mousumi Banerjee is a professor of Biostatistics at University of Michigan, Ann Arbor. Her subject of research is cancer. Science gives her the intellectual stimulation but literature is her shelter for the soul. Her first published book of poems is called "Eklaghar".

প্রকৃতির রোষ

নন্দিতা রায়

কবিতার ভাষা, পুরাণের কথা, কাব্য কাহিনী যথা,
ললিতকলা, আনন্দময় সৃষ্টির যত কথা ।
স্তব্ধ করেছে বিজ্ঞান তার ধ্বংসের ব্রত এনে,
মানব প্রকৃতি কল্যাণ ভুলে মৃত্যুরে আনে টেনে ।

পৃথিবীর জল, পৃথিবীর হাওয়া প্রকৃতির যত দান
সৃষ্টি ধ্বংসী অস্ত্রের রাশি নষ্ট করেছে প্রাণ ।
বিজ্ঞান ভুলেছে কল্যাণ দান তার গবেষণাগারে,
হাইড্রোজেন বোমা, বিষাক্ত গ্যাস তারি নিঃশ্বাস ছাড়ে ।

কেবল ধরিত্রী সর্বংসহা সহ্যের সীমা তারও,
মানব পশুর অস্ত্র আঘাতে কেঁপে ওঠে থরো থরো ।
প্রবল পবন, জলের প্লাবন, নিদাঘ ঊষর কালে,
শস্য বিহীন শুষ্ক তৃণে বিদ্যুৎ অগ্নি জ্বালে ।
. . . . . .
ধ্বংসের বীজ রয়েছে লুকায়ে তাঁরও অস্ত্রাগারে ।

নন্দিতা রায় : ক্যানাটা, কানাডা : বহু বছর ধরে সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য রচনা করা নন্দিতার বিশেষ ভাল লাগার জায়গা । নিয়মিত গল্প ও কবিতা লেখেন ।

চেনা মুখ

অতীশ ব্যানার্জ্জী

সিদ্ধান্তটা খুব হঠাৎ করে নিয়েছিলাম,
সন্দীপের মেসের ভাঙা বিছানাটায় বসে ।
রাত্রি তখন আঁচল গুছিয়ে বিদায় নিচ্ছিল –
একগাদা ক্লান্ত সিগারেটের ফিলটার
আর বুড়ো সন্ন্যাসীর নিঃস্ব বোতলটাকে মুখ ভেঙচে
কুয়াশা আর দিনের প্রথম আলোর পাঞ্জা লড়ার মাহেন্দ্রক্ষণে ।

ধন্যবাদ তোমায়, আমার একতরফা প্রেম –
তুমি অমলিন !
ভিখারীর মত বড্ড হাল্কা লাগছিলো নিজেকে,
কোন এক থমকে যাওয়া মুহূর্তে –
ভাঙা আয়নার কাঁচে ছবি হয়ে আটকে থাকা
অনুভূতির টুকরোগুলো
ঘরে ফেরার রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছিলো ।
ওরা আর আমি অপেক্ষায় ছিলাম,
তোমার হাত ধরে রাস্তা পার হবো বলে ।

জানো, যখন তোমায় ঝড়ের মত দুরন্ত ভালোবেসেছিলাম
বড্ড একলা ছিলাম আমি;
খুব সকালের তেতো মুখের প্রথম চা চুমুক,
ঝড় শেষের ক্লান্ত শ্রান্ত আবেশ –
রোজ সকালের মত আবার নতুন করে মনে করিয়ে দিলে
ভালো তুমি বাসোনি বটে
তবে চিনিয়ে দিয়ে গেছো –
ভালোবাসাকে ।

সেন . . . স্

অতীশ ব্যানার্জ্জী

গহিন বনের অনেক দূরে চাঁদের ছায়ার পাশে
ঝপাৎ করে আমার চোখে সন্ধে নেমে আসে
পাহাড় ফুঁড়ে আকাশ চিরে পক্ষীরাজের লাগাম
হচ্ছে ভাজা চিঁড়েভাজা, ঝালমুড়ি আর বাদাম
জ্বলছে আলো রঙটা কালো মিষ্টি গানের গলা
ফুটছে বাজী চা পিঁয়াজী পাঁউরুটি আর কলা
শুকনো শশা ভালোবাসা চোখের কোণে কালি
বইছে হাওয়া উপরি পাওয়া একলাটি হাততালি
মিথ্যে কথা হ্যাঁচকা ব্যাথা ডাক না পাওয়া মন
বাড়ছে দেনা যাচ্ছে কেনা বোবা টেলিফোন
হচ্ছে চরম বেজায় গরম নস্যি ঠাসা নাকে
বাড়ছে প্রেম সাহেব মেম পড়ছে কাঠি ঢাকে
খুঁজছো মানে চানের গানে গুটখা খাওয়া মুখে
ভাঙছো বাড়ী ছাগল দাড়ি চোখ বোজানো সুখে
ছাড়ছো হাত আমি কুপোকাত ইনফ্লেশনের যুগে
মাখা সন্দেশ ফ্রীজে ছিলো বেশ ডায়বেটিসে ভুগে
কি লিখি ছাই ল্যাজামুড়ো নাই আঁতলামিতে ঠাসা
রোগা থাকবেন ? সহজ উপায় দইয়ের সাথে শশা ।

Atish Banerjee from North burbs of Greater Chicago, IL, working in healthcare advisory space and love to travel, read and dream.

আড়ি

দেবাশীষ ব্যানার্জী

শীতের অকালবোধনে
আকাশছোঁয়া দেবদারুর পাতায়
রঙিন সময়ের ভার,
রেশম বুনতে বুনতে, সেখানে কিছু
অভিমানী তন্তু জমেছে, সারাদিন

আসমানী রঙের ছাদ জুড়ে স্যাঁতস্যাতে কাজল
আর তার ফাঁকে ফাঁকে মেঘেদের দ্বীপ,
গাঁজালো ধোঁয়ার মতো ভারী সে সাদা,
জলরঙে ওদের ধরতে পারিনি বলে
বুকে টেনে নিয়ে, ফুসফুসের ডানায়
চাকা চাকা রক্তের দাগ এঁকেছি, সারাদিন

সন্ধে নামতে আলোর টুকরোগুলো
আটকে ছিলো কাঁচে,
শরতের বিন্দু বিন্দু হিম
শাখানদীর মতো বইতে চেয়েও
ওদের বুকে নিয়ে স্থির, সমীচীন

চোরাবালির উপত্যকায়
আবহমান আকাশগঙ্গার ধারা
তারই নিচে পাতা শয্যায় দুভাগ,
পাশবালিশের দেওয়াল বেয়ে
উঠে গেছে আত্মম্বরি পারিজাতের দল,
সেখানে স্পর্ধার জোনাকিরা
একটু একটু করে নিভছে

Debasish Banerjee lives in Michigan, USA. His writing has been published in different little magazines.

আমাদের কবিতা

সন্দীপ ভট্টাচার্য্য

প্রজাদের রক্ত-মাংসে গড়া রাজপথ
প্রাসাদের চতুষ্কোণ-এ শ্রমিকদের অস্থিমজ্জা
রাজনীতির মারপ্যাঁচে তোমরা
শেখো ঘোলা জলে মাছ ধরা ।

আমরা শান্তির মিছিলে সামিল হই
তোমরা যুদ্ধের দামামা বাজাও
আমরা যখন সন্তানদের নিয়ে স্বপ্ন সাজাই
তোমরা তখন ধ্বংসে উন্মত্ত হও ।

আমরা পরিবেশ সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ
তোমরা দূষণের বিনিময়ে মুনাফায় সমৃদ্ধ
আমরা যখন জলবায়ুর পরিবর্তনে আতঙ্কিত
তোমরা তখন প্যারিস চুক্তি নিয়ে রাজনীতিতে ব্যস্ত ।

আমরা সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অবিচলিত
তোমরা জনগণের সচেতনতা দেখে হও শঙ্কিত
আমরা যখন ঐক্যের দেওয়াল মজবুত করি
তোমরা তখন বিভেদের প্রাচীর তোলো ।

Sandip Bhattacharjee resides in Sydney and is a poet, writer and a passionate spoken word performer. He is well known as a powerful actor having acted in multiple successful productions in Sydney.

গল্প

স্মৃতি – সত্তা – অনুপম

মানস ঘোষ

মনটা বড় অস্থির লাগছিল দেবমাল্যর। বাসে, ট্রেনে, রাস্তায় এত কোলাহল কিছুই যেন ছুঁতে পারছিল না ওনাকে। সেই কোন ভোরে বেরিয়ে, কখন কিভাবে হাওড়ার এই গ্রামে এসে পৌঁছলেন, এখন সময় কত, কোন কিছুই আর ভাবতে ভাল লাগছিল না। কাল রাতে খবরটা পেয়ে থেকেই উচাটন হয়ে আছে মনটা। এক অদ্ভুত বেদনায় যেন তাঁর শরীর মন, সমস্ত অস্তিত্ব অবশ হয়ে আসছে।

অনুপম আর নেই। কথাটা যেন এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না দেবমাল্য। ওর সারল্য, ওর অকপটে-ভাষণ সবকিছু নিয়ে এতো প্রাণবন্ত একটা ছেলে এভাবে অকালে চলে গেল ! সত্যিই ভাবা যাচ্ছে না। অনুপম একটু মজা করে প্রায়শই বলত, স্যর, 'আপনি হলেন আমার স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ !

আজ দেবমাল্যর মনে হতে লাগল, অন্তরাত্মাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে, স্নায়ুতন্ত্রের সমস্ত জাল ছিঁড়ে ওর অপর সত্তা যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে।

দেবমাল্য মনে মনে সবসময় স্বীকার করেন, গত কয়েকবছরে তাঁর এই ক্রমাগত সাফল্য, একদা অনামী কবি থেকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক হয়ে ওঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অনুপমের সাহচর্য। ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী, আর তার সঙ্গে ওর নানা মৌলিক এবং আপাতউদ্ভট মতবাদ। যেমন, দেশে বহুবিবাহ চালু থাকলে অপরাধ কমতো' ওর এই অদ্ভুত তত্ত্ব নিয়ে দেবমাল্যর একটি রম্যরচনা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

নানা ব্যাপারে ওর যে এই নিজস্ব বিশ্লেষণ, তা অবশ্য সব জায়গায় বলত না। দেবমাল্যকে বলত, 'আপনার কাছেই যেটুকু প্রাণ খুলে কথা বলি, ভুল হোক বা ঠিক হোক, আপনি আমার যুক্তি গুলো মন দিয়ে শোনেন।'

অন্য কোথাও এসব যুক্তিকথার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুপম ভালই সচেতন ছিল। দেবমাল্য সত্যিই মন দিয়ে শুনতেন। এই বয়সে যে ও কতরকম লোকের সঙ্গে মিশেছে। কি বিচিত্র যে ওর অভিজ্ঞতা ! সত্যি বলতে কি, এই অসমবয়সী সঙ্গীটির জন্যই দেবমাল্যর কখনো মৌলিক প্লটের অভাব হয়নি।

আমতা হাওড়া ট্রেন রাস্তায় এক ছোটো প্যাসেঞ্জার হল্ট, ঝালুয়ারবেড়। সেখান থেকে রোজ যাওয়া আসা যাদবপুর ক্যাম্পাসের গায়ে ওর চায়ের দোকানে। এই যাতায়াতের পথে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলা মেশায়, তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনে, দিন দিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল অনুপমের অভিজ্ঞতার ভান্ডার। ওকে নিয়ে অসংখ্য স্মৃতির কোলাজ ভেসে উঠতে থাকে মনের পর্দায়। ক্রমশ আরও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন দেবমাল্য। ভোরবেলা ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে এসেছেন। একবারও ভাবেননি ঠিকমত রাস্তা চিনে আসতে পারবেন কিনা। যার থেকে খবরটা পেলেন, এই গ্রামেরই ছেলে, ওর থেকে পথনির্দেশটা জেনে নেওয়া উচিত ছিল। অবশ্য এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। হয়তো এতদিন ধরে অনুপুঙ্খ বর্ণনা শুনেছেন বলেই, ... 'আমতার দিকে মুখ করে নামলেই বাঁদিকে বড় শিবমন্দির। পাশ দিয়ে চলে গেছে সরু পিচ রাস্তা। একটু এগোলেই দেখবেন স্যার, রাস্তাটা একটু চওড়া হয়েছে আর বাঁহাতে একটা শীতলা মন্দির . . .।'

বোঝা যাচ্ছে কাছাকাছি এসে পড়েছেন। রাস্তায় নানা জায়গায় জটলা। সবাই ওকে নিয়ে আলোচনা করছে। আর করবে নাই বা কেন, অত্যন্ত পরোপকারী ছেলে ছিল যে। সবাই ভালবাসত দরাজ মনের এই অনুপমকে। অবশ্য পরোপকার শব্দটায় প্রবল আপত্তি ছিল ওর। বলত, ''ঈশ্বর যে আমাকে কাজটা করার সুযোগ করে দিলেন, সেটাই আমার ভাগ্য। আমার জমা খরচের হিসাব তো তিনিই মেলাবেন। তাই যা করি শেষ পর্যন্ত নিজের লাভের জন্যই করি। ঠিক কি না বলুন স্যার ?''

দেবমাল্য হেসে বলতেন, ''বাবা অনুপম, তুমি যদি একটু গেরুয়া পরে ধুনি জ্বেলে গাছতলায় বসতে, তোমার বাণী শোনার জন্য বহু লোকে আসতো।''

এই অনুভূতিশীল ছেলেটির সব কথা বুঝতে পারে এমন কোনো মানুষ ছিল না ওর পরিবারে বা আশেপাশে। সহধর্মিণীটি বেশ ভালই। সংসারের সব কাজ একাই সামলায়। কিন্তু অশিক্ষা আর নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে হঠকারী ক্রোধ যোগ হয়ে প্রায়ই দুর্বিষহ হয়ে উঠত অনুপমের দাম্পত্য অভিজ্ঞতা। দেবমাল্য লিখেছিলেন ওদের কথা,

'আবছা অন্ধকার চেতনার গলিপথে।

অজানা বাঁকে গুপ্তঘাতক, চন্ডাল ক্রোধের ছুরি হাতে।

প্রায়শই ছিন্নভিন্ন ভালবাসার গোড়ার কথা, — বাকী, মূল্যবোধ আর কৃতজ্ঞতাও রক্তে মাখামাখি।'

এছাড়াও নানা ছোট বড় দুঃখের জায়গা ছিল অনুপমের জীবনে। কিন্তু কোনোটা নিয়েই ওকে বিষাদগ্রস্ত হয়ে এক জায়গায় আটকে যেতে দেখেননি দেবমাল্য। বরং অত্যন্ত ভাবলেশহীন ভাবে এই গল্পগুলো শোনাত ও। আর সব গল্পের শেষে ছিলো ওর অমোঘ উপসংহার, একান্ত নিজস্ব কিছু বিশ্লেষণ। হয়ত সেগুলোই ওকে দমে যেতে দেয়নি, সবসময় উঁচু তারে বেঁধে রেখেছিল ওর মনটাকে।

এই পরোপকারী, নির্ভীক মনটাই যে ওর মৃত্যুর কারণ হবে, সেকথা স্বপ্নেও ভাবেনি দেবমাল্য। কাল বিকেলে ছুটন্ত ট্রেনের সামনে থেকে এক বৃদ্ধকে সরাবার পর নিজে আর টাল সামলাতে পারেনি। পাশের ইলেকট্রিক খুঁটিতে লেগে মাথাটা একেবারে দু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল।

ভাবতে ভাবতে অনেকটা হেঁটে ফেলেছেন দেবমাল্য। কিন্তু অন্যদিনের মতো ক্লান্তি লাগছে না তাঁর। এমনকি হাঁটুর ব্যথাটাও জানান দেয়নি তেমন। শুনেছিলেন, জোরাল কোনো মানসিক আঘাত পেলে কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোনো যন্ত্রণা টের পাওয়া যায় না। আজ তেষট্টি বছর বয়েসে এসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল।

এমন একটা দুর্দান্ত প্রাণ, এখন একেবারে শান্ত, সাদা চাদরে ঢাকা। শোয়ানো আছে খোলা উঠোনে। ভীড় কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন দেবমাল্য।

দেহের পাশে বসে অঝোরে কাঁদছে ওর স্ত্রী। কতই বা বয়স হবে মেয়েটির, বড়োজোর তিরিশ। অনুপমের ছ'বছরের মেয়ে কি বুঝেছে কে জানে, চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে, সাদা চাদরের একটা কোণ ধরে। দেবমাল্য জানেন, ওর নাম আলো। ওর যমজ বোনের নাম ইচ্ছা। দেবমাল্যই দিয়েছিলেন নামগুলো, ওর ভালো লাগা কবিতা থেকে।

'ঝিল পেরোলেই তেপান্তরের মাঠ

আকাশ সেখানে কুসুমের সাথে মেলে।

ইচ্ছা-আলো সেখানেই এক সাথে

ঘাসের চাদরে লুটোপুটি করে খেলে।'

কি মনোরম ছবি এঁকেছিলেন !

আজকের পর ওদের অনিশ্চিত শৈশব। চরম অসহায়তার সঙ্গে অসম লড়াই। কবিতার লাইন যেন তীব্র ব্যঙ্গ হয়ে মাথায় বিস্ফোরণ ঘটাতে থাকে। প্রবল চেষ্টায় ঝেড়ে ফেলতে চান দেবমাল্য। বর্ণমালা আবছা হয়ে আসে।

চারজন ধরেছে চারদিকে, এবার ওকে নিয়ে যাবে। দেবমাল্য শেষবারের মত ছুঁতে চাইলেন ওর দেহটা। পারলেন না, সম্ভবত সময়ের গরমিলে। তাছাড়া তাড়াহুড়োতে চশমাটাও ফেলে এসেছেন বাড়িতে।

না, এবার ফিরতে হবে। অনেক বেলা হয়ে গেছে। কাউকে কিছু বলে আসেননি। বৌমা দুশ্চিন্তা করবে। বেচারি একলা আছে। ছেলে অফিসের কাজে জামশেদপুর গেছে। কাল ফিরবে।

এদিকে অস্বস্তিটা ক্রমশ বাড়তেই থাকে দেবমাল্যর। এতটা রাস্তা গেলেন, অনুপমের গ্রামে এত লোকের মাঝে ছিলেন, ফেরার পথেও বহু মানুষজন, কিন্তু কেউ যেন সেভাবে চিনতেই পারছে না ওনাকে। মানছেন, সাহিত্যিকরা সবার খুব পরিচিতি মুখ হয় হয়না, তা হলেও আজকাল টিভি চ্যানেলে বেশকিছু আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদিতে যোগ দেওয়ার পর, রাস্তাঘাটে বেরোলেই খ্যাতির বিড়ম্বনাটি বেশ টের পান দেবমাল্য। কিন্তু আজকের দিনটা যেন সবদিক দিয়েই আলাদা। সবকিছুই অন্যরকম হচ্ছে।

চিন্তার জাল কেটে গেল। বাড়ির কাছে এসে পড়েছেন। এত ভীড় কিসের !

মূল গেটের সামনে থেকেই লোকে লোকারণ্য। কিন্তু আশ্চর্য রকম নীরব। কাউকে কিছু আর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছিল না। নিজেরই যা মনের অবস্থা, এত লোকজন আর ভাল লাগছিল না। নিজের ফ্ল্যাটের দিকে এগোলেন দেবমাল্য। ভীড়টা যেন সরে গিয়ে জায়গা করে দিল।

শুধু একটা সাদা ফুল দিয়ে সাজানো ম্যাটাডোর প্রায় গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। বুকটা একটু কেমন করে উঠল। আজ থেকে দুবছর আগে, অরুণাও চলে গিয়েছিল এমন এক সাদা ফুলের গাড়িতে। অনেক চেষ্টা করেও আটকাতে পারেননি দেবমাল্য।

ফ্ল্যাটের সামনে বেশ বড় একটা জটলা। কাছাকাছি বইপাড়ার কিছু চেনা লোককেও দেখতে পেলেন, নিচু গলায় কথা বলছে সবাই। আরে ঐ তো দেবাংশু !

ওর তো কাল ফেরার কথা। রাতের ট্রেনে ফিরছে মনে হয়। চোখমুখও খুব ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।

ছেলের দিকে এগিয়ে গেলেন দেবমাল্য, ওকে বলা দরকার, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও, এসব হট্টগোলের মধ্যে তোমার এখন থাকার দরকার নেই।

দেবাংশুর কাছে পৌঁছানোর আগেই দেখলেন, দিলিপবাবু এসে ওকে কিছু বলছেন। উফ ! এই এক লোক, সর্বঘটে ....

উনি আবার কি চাইছেন ?

উনি কি বললেন শুনতে না পেলেও দেবাংশুর উত্তরটা স্পষ্ট শুনতে পেলেন দেবমাল্য। আর সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, ফ্ল্যাটের ঠিক সামনের জটলার মাঝে কি আছে, আজকের দিনটায় কেন সবকিছুই অন্যরকম হচ্ছিল ... মায় হাঁটুর ব্যথাটা পর্যন্ত।

দেবাংশু তখনো বলে চলেছে,

'.... এমনিতে বেশ সুস্থই ছিলেন। খালি কাল সন্ধ্যেবেলা একটা দুঃসংবাদ পেয়ে একটু মুষড়ে পড়েছিলেন। ডাক্তারবাবু তো বললেন, ভোররাতের দিকেই ....

দেবমাল্য ভীড় ভেদ করে এগোতে লাগলেন। একটু শুতে হবে। বিশ্রাম দরকার।

মানস ঘোষ। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক''। এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে।

কল্প

ইন্দ্রানী দত্ত

ফুলশয্যার রাত অবধি অহনার ধারণা ছিল, সব বাড়িরই নিজস্ব কিছু পুরোনো গল্প আছে । প্রাচীন বালাপোষ আর জরিপাড় শাড়ির সঙ্গে সেইসব কাহিনী মথবল দিয়ে তুলে রাখা থাকে । তারপর যেদিন আত্মীয় বন্ধু বহু বৎসর পরে একত্রিত — হয়ত বিবাহ, কিম্বা অন্নপ্রাশন, অথবা শ্রাদ্ধবাসর — সেই সব গল্পকথা আলমারির অগম সব কোণ থেকে আলগোছে বের করে এনে রোদে দেওয়া হয় । এমনি করে, প্রপিতামহর খুল্লতাত অথবা অতিবৃদ্ধ মাতামহীর পিতৃশ্বসাপতির একটি দুটি আখ্যান, ব্রোকেন টেলিফোন খেলায় যেমন হয় আর কি — মুখে মুখে ফেরে আর একটু একটু করে বদলে যেতে থাকে । আসলে, অহনা এরকম কিছু গল্প শুনে বড় হয়েছে; প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ মাতামহী অথবা পিতৃশ্বসাপতি শব্দগুলি এবং পুরোনো ভারি অলঙ্কারের মত সরোজিনী, বা নীলাম্বর অথবা সরসীবালা নামের প্রতি প্রগাঢ় মায়াও তার আশৈশব । বস্তুত, অহনার নিতান্ত বাল্যকালে, পিতৃপক্ষে, তার জ্যেষ্ঠতাত বাড়িতেই তর্পণের আয়োজন করলে, অহনা ঘুম ঘুম চোখে, সেইখানে গিয়ে বসত । আশ্বিনের সেই সব ভোর - তাদের বড় ঘরের লাল মেঝে — কোশাকুশি তাম্রপত্র-জ্যৈষ্ঠতাতর গরদের ধুতি চাদর কপালে চন্দন আঙুলে কুশের আংটি- এতৎ সতিল- গঙ্গোদকং, তৃপ্তিমখিলাং যাস্তু অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা- রহস্যময় সে সকল শব্দ . . . প্রতিটি কথা, সমস্ত পুরাতন নাম, প্রাচীণ সম্পর্ক নিজের মনে, নিজের স্বপ্নে ঢুকিয়ে নিত বালিকা; অবসরে, ঘুমে, শব্দগুলির সর্বাঙ্গে হাত বোলাত পরম মমতায় —

অহনাদের বাড়িতে, যে দু তিনটি গল্পকথা ঘুরে ফিরে বেড়াত-নবীন জামাতা, নববধূ বা নবলব্ধ কুটুম্বকে শোনানো হ'ত, তার মধ্যে দুটি কাহিনী তার প্রিয় ছিলঃ অহনার প্রপিতামহীর কোনো খুল্লতাত সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন — গল্পে তিনি সন্ন্যাসীদাদু । বলা হ'ত, সন্ন্যাসীদাদু নাকি এখন ও তাঁর বংশধরদের দেখা দেন — গৃহস্থের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেন সন্ন্যাসী — হাতে দন্ড, কমন্ডলু, মাথায় পাগড়ি, শরীরে দিব্যাভা — দু দন্ড বসেন, তারপর আশীর্বচন আউরে স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে যান । বস্তুত অহনার ঠাকুরমার পুজোর ঘরে সেই সন্ন্যাসীর একটি ছবি ছিল — ফ্রেমে বাঁধানো হলদেটে ছবিতে পাহাড়ি নদী গাছ ঘরবাড়ি দেখা যেত - সামনে তিনি হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে । ছবিটি অহনার খুব প্রাচীন মনে হত না । সে কথা বললে, ঠাকুমা দুই হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে বলত — 'হ্যার বয়স বাড়ে না' । অহনা বিশ্বাস করত না কিন্তু গল্পটা ওর ভালো লাগত; ছবির সঙ্গে গল্প বা গল্পের সঙ্গে ছবি মেলাতে চাইত । ছবিখানি কবে কে কোথায় তুলেছিল, সে ছবি ঠাকুমার কাছে কি করে এল তা নিয়েও এযাবৎ অচরিতার্থ কৌতূহল অহনার ।

সন্ন্যাসীর দাদুর গল্প ব্যতীত বৃদ্ধপ্রপিতামহী হিরণ্যপ্রভার কাহিনী অহনার অতীব প্রিয় ছিল । শোনা যায়, হিরণ্যপ্রভা চিত্র রচনায় সবিশেষ পটু ছিলেন — গৃহস্থলির সমস্ত কাজের মধ্যেও উঠান, তুলসী মঞ্চ, গৃহের মৃৎপাত্রগুলিতে তিনি নিরন্তর ছবি এঁকে চলতেন — অঙ্কনকালে শত ডাকেও সাড়া দিতেন না । একদা দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা ভোজনে রত, মেয়েরা সন্তানের পরিচর্যায় অথবা রন্ধনে কিম্বা পরিবেশনে ব্যস্ত — বেলা অনেক, অথচ সেদিন তখন ও তাদের স্নান ও সারা হয়নি — সেই সময় উঠোনে এক বিশাল হাতি এসে দাঁড়িয়েছিল । হাতির সর্বাঙ্গে অলংকরণ, হাওদাটি সুসজ্জিত । উঠোনে দাঁড়িয়ে মাহুতবিহীন সুবৃহৎ সে হাতি বৃংহণ করেছিল । সেই ধ্বনিতে, রন্ধনকক্ষ থেকে হিরণ্যপ্রভা বেরিয়ে এলে, হাতিটি হাঁটু মুড়ে বসে এবং হিরণ্যপ্রভা কোনোদিকে না তাকিয়ে হস্তীপৃষ্ঠের সুসজ্জিত হাওদায় অধিষ্ঠিত হন । কথিত আছে, সে সময় তাঁর ঘোমটা খসে পড়েছিল — রুক্ষ কেশদাম মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোয় মুকুটের মত দেখাচ্ছিল । সেই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে, হাতিটি তাঁকে পিঠে নিয়ে মিলিয়ে যায় । হিরণ্যপ্রভা আর ফিরে আসেন নি ।

এই গল্পদুটি, কলেজ জীবনে অহনা ওর প্রাণের বন্ধু শাল্মলীকে বললে, শাল্মলীও অনুরূপ কিছু ঘটনা শোনায় — যেমন, কোনো কালে, শাল্মলীর মামার বাড়ির দিকের এক বাল্যবিধবা গভীর রাতে নির্জন ছাদে, দুহাত আকাশে তুলে আপন মনে

ঘুরে ঘুরে নেচে চলত; তারপর এক জ্যোৎস্না রাতে সে ডানা মেলে উড়ে গিয়েছিল। শাল্মলী তার নাম বলতে পারে নি। অহনা বলেছিল, 'নাম না থাকলে, গল্প ভালো লাগে না। ওর নাম আমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখি ? অঙ্গনা ?'

— 'ঠিক। অনাম্নী অঙ্গনা'। শাল্মলী হেসেছিল।

বস্তুতঃ এই সব প্রাচীন কাহিনীর আদানপ্রদান অহনার প্রিয় ছিল। নতুন আত্মীয় পরিজন, নবলব্ধ বন্ধুদের এই গল্প শোনানো সে বাধ্যতামূলক মনে করত — যেন এ গল্প না শোনালে তার পরিচয় দেওয়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব, অহনা যে ফুলশয্যায় তার নবীন স্বামীটিকে সন্ন্যাসীদাদু অথবা হিরণ্যপ্রভার কাহিনী বলবে এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। গল্প শেষ করে সমরের পরিবারের অনুরূপ প্রাচীন কোনো গল্প শুনতে চেয়েছিল অহনা। সমর বলেছিল, তোমার মত গল্প শোনার টাইম আমার ছিল না। গল্প ঠল্প কিছু নেই আমাদের। তারপর মিলনে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

অহনার শ্বশুরমশাই বহুদিন গত, শাশুড়ী পক্ষাঘাতগ্রস্থ — প্রাচীন কোনো কাহিনী জানা থাকলেও তা বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সমরের বাড়ির চিলেকোঠায়, খাটের তলার প্রাচীন তোরঙ্গে কোনো প্রাচীন অক্ষর সে খুঁজে পায় নি গত এক বছরে। কেবল, সমরের মামাবাড়িতে প্রণাম করতে গিয়ে, ঠাকুরঘরে আলমারির মাথার ওপরে নীল মার্কিন কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া এক বাদ্যযন্ত্র দেখেছিল।

অহনা বলেছিল, 'এস্রাজ ? কে বাজায় ?'

সমর আশ্চর্যরকম কঠিন মুখ করে বলেছিল, 'বাজাতো। আমার ছোটমাসি।' তার যে কোনো মাসি শাশুড়ি আছেন তাই জানতনা অহনা — সে অবাক হয়ে তাকালে, সমর বলেছিল — 'হারিয়ে গেছে'।

— কেমন করে ?' অহনা জিজ্ঞেস করেছিল। এই প্রথম সমরের পরিবারের সে একটি গল্পের খোঁজ পাচ্ছিল।

সমর বলেছিল — 'জানি না। হারিয়ে গেছে, ব্যাস। তোমাদের মত হাতী ঘোড়ার গল্প আমাদের নেই।'

— 'কি নাম ছিল ছোটমাসির ?'

সমর মুখ শক্ত করে বলেছিল — 'অনু'।

অনু কি অনুরাধা না অনুশ্রী না অনুমিতা, অনন্যা অথবা অঙ্গনা — এই সব জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হয়েছিল অহনার। সমরের মুখের ভাব দেখে সে আর কথা বাড়ায় নি।

ডিসেম্বরের শেষে, সমরের কিছু কাজ পড়ল সিউড়িতে। অহনা শান্তিনিকেতন যাবে কি না জানতে চাইলে, সে এক কথায় রাজি হল। ছোটবেলায় একবার শান্তিনিকেতন যাওয়া ঠিক হয়েও ওর চিকেন পক্স হওয়ায় সব পন্ড হয়েছিল। পরবর্তী কালেও, সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা ও চর্চার জন্য অহনা সেখানে যেতে চেয়েছিল। অহনার গলায় সুর ছিল — সে ভালো গাইত। কিন্তু ততদিনে সমরের সঙ্গে অহনার বিবাহ স্থির — পিতৃদেব এক কথায় অহনার ইচ্ছেয় না বলেছিলেন। এত বছর পরে, ডিসেম্বরের রাতে, আবার শান্তিনিকেতনের কথা উঠল। অফিস থেকে ফেরত সমর সবিশেষ উত্তেজিত ছিল সেদিন। বলছিল, শান্তিনিকেতনে ওর বন্ধুর বাড়ি, সেখানে থাকা যাবে, হোটেল ফোটেলের বুকিং এর দরকার হবে না।

সিউড়ির কাজ শেষ করে সমর যখন অহনাকে নিয়ে বোলপুর এলো, তখন ভাঙামেলা। মেলার মাঠে তবুও ভীড়, নাগরদোলা, টুরিস্ট বাস, শালপাতা। ওরা দুপুরে খানিক ঘুরল। বাটিকের ব্লাউজপিস, পোড়ামাটির গয়না আপেলবীচির মালা — এইসব টুকটাক দরাদরি করছিল অহনা।

সেদিন সন্ধ্যায় খ্রীষ্টৎসব। বিকেল বিকেল কাঁচঘরের বারান্দায় বসতে না পারলে, হিমে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বাইরে সমরের বন্ধুর বাড়ি থেকে জানা গিয়েছিল। সেইমত, বিকেল পড়তেই ওরা কাচঘরের দরজার গোড়ায় শতরঞ্জিতে বসে

পড়ে । ভেতরে তখনও সাজসজ্জা ও বৈদ্যুতিক সংযোগের কিছু কাজ চলছিল । ভীড় ক্রমে বাড়ছিল । ঘর ছাপিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি ছাপিয়ে রাস্তা অবধিও মানুষজন । চাদর, জহর কোট, সোয়েটার, জ্যাকেট । আলো কমে আসছিল, হিমভাব বাড়ছিল । কাঁচঘরের ভেতরে গায়ক গায়িকারা সমবেত — একাধিক তানপুরার শীর্ষদন্ড দেখা যাচ্ছিল । সমর উসখুস করছিল একবার বলছিল বাথরুম যেতে হবে, একবার বলছিল ঠান্ডা লাগছে, টুপি আনতে হবে, আবার সিগারেট খাওয়ার জন্য ছটফট করছিল — ভিতরে উঁকি দিচ্ছিল — বাইরে তাকাচ্ছিল — তার মুখে রাগ আর অসহায়তা দেখছিল অহনা । — 'কী শালা ফেঁসে গেলাম এখানে । এই ঠান্ডায় এই সব কাঁদুনি শুনতে হবে এতক্ষণ । শুরু হবে কখন তাও তো বুঝছি না ।' অহনার অস্বস্তি হচ্ছিল । বলল 'এক্ষুনি হবে, দেখো না, সবাই এসে গেছে ।'

সমর ওর কনুই টেনে বলল 'চলো ফিরে যাই । লেপের তলায় ঢুকে যাবো সোজা' । বলে সামান্য চোখ মারল অহনাকে । অহনা বলল 'এক্ষুনি শুরু হবে । একটু বসো । আর হয়তো কোনদিন আসাও হবে না' ।

— 'যাবে না কি ক্রন্দনসঙ্গীত শুনবে ? আমি চললাম । সমর ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দেয় । তারপর বেরিয়ে যায় । অহনাও সমরের অনুগামী হয়ে উঠে দাঁড়ায়, হাতের ব্যাগ তুলে নিয়ে, শাড়ি, শাল গুছিয়ে, বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে । ঠিক তখন কাঁচঘরে সমস্ত তানপুরার একসঙ্গে সুর মেলানো শুরু হয় । শীত না কি আকস্মিকতা — অহনা আমুল কেঁপে উঠে আবার বসে পড়ে । সে যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে কাঁচঘরের ঝাড়লণ্ঠন দেখা যাচ্ছিল আর তানপুরার শীর্ষগুলি — কখনও হাতের আঙুল-সুর বাঁধছে । অহনার মনে হ'ল, সে যেন এক অলীক কক্ষের দোরগোড়ায় — যেখানে কেবল সুর ভেসে বেড়াচ্ছে — একটি তানপুরার সুর যেন অন্য তানপুরা তুলে নিচ্ছে, তারপর আর একটি তানপুরা, সেখান থেকে আর একটি । শেষ তানপুরাটি থেকে বেরিয়ে একলা সুর অতঃপর যেন ওপরে উঠছে, ঝাড়লণ্ঠন ছুঁয়ে ভেসে ভেসে অহনার কাছে আসছে, এরপর সুরে সুরে জড়িয়ে ঈষৎ ভারি হয়ে নিচে নামছে, আবার উঠছে ।

ধুপের ধোঁয়ার মত সুরের এই চলাচল অহনাকে ঘিরে ফেলছিল । এক মায়াবরণ যেন অহনার শ্রুতি দৃষ্টি আর মননে জড়িয়ে যাচ্ছিল — আবরণ সরালেই যেন এক অভূতপূর্ব মুহূর্তের সম্মুখীন হবে সে — এরকম তার মনে হচ্ছিল । সমর এসে আবার ওর পাশে বসতে পারে, নাও পারে — অহনার তা নিয়ে আর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না — সমরের কথা অমান্য করার জন্য কোনো ভয় কাজ করছিল না আর — বরং ওর মন সমর, তাদের মিল, তাদের অমিলগুলি পেরিয়ে যাচ্ছিল দ্রুত — ঘর দোর সংসার অস্পষ্ট হচ্ছিল । ওর মনে হচ্ছিল, সম্ভবতঃ এই সেই মুহূর্ত — যখন মানুষ হারিয়ে যায়, হয়ত ডানা মেলে উড়ে যায় ভরা জ্যোৎস্নায় । সে ভাবছিল এবং ক্রমশঃ বিশ্বাস করছিল । অহনার মনে হচ্ছিল, কিছু একটা ঘটবে, খুব বড় কিছু ঠিক কী ঘটবে সে জানে না, কিন্তু তার জন্য আনন্দিত চিত্তে অপেক্ষা করতে পারবে । অহনা কাঁপছিল, ওর চোখে জল আসছিল, দু হাত জড়ো করে এই মুহূর্তটিকে সে আগলে রাখতে চাইছিল আর সমস্ত শরীর দিয়ে এই অপরূপ সুর মেলানো অনুভব করছিল, শুষে নিচ্ছিল ।

গান শুরু হয়ে গিয়েছিল । আচার্য কিছু বলছিলেন । হিম মাথায় নিয়ে অজস্র মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল । মোমবাতি জ্বলছিল । মেলার মাঠে সম্ভবতঃ বাজি পোড়ানো চলছিল । আকাশে একটি আলোক বিন্দু সহস্র আলোক বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল — গাঢ় বেগুনী আকাশে আলোর কণাগুলি কখনও সিংহের কেশর, কখনও সুবৃহৎ অগ্নিপুষ্পর পরাগরেণু তৈরি করছিল, তারপর ছাই হয়ে ঝরে পড়ছিল হিমভেজা মাঠে ।

সেই সময়, বল্লভপুরের হরিণের বন পেরিয়ে এক বিশাল গজরাজ আম্রকুঞ্জের দিকে ধাবিত । সে ঐরাবতের সর্বাঙ্গে অলংকরণ, পৃষ্ঠে সুসজ্জিত হাওদা ।

ইন্দ্রাণী দত্ত — সিডনির বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্প লেখার তীব্র আকুতি টের পান । শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ''আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয় । পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ ।'' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন ।

গল্প

বইপাড়ায় বৃষ্টি

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

নীল আর তন্ময় । আগে থেকেই চিনত পরস্পরকে । শুধু চিনত না, বুঝতেও পারত দুজনে দুজনকে । নীলের তন্ময়ের উপর বা তন্ময়ের নীলের উপর দাবী ছিল না কোন । কিন্তু প্রতিশ্রুতি ছিল । সে প্রতিশ্রুতি আপাতদৃষ্টিতে কারও চোখে পড়ার উপায় ছিল না ।

বইয়ের দোকানটি ছোট । বৃদ্ধ দোকানী নিজেই বই পাঠে নিমগ্ন । খদ্দেররা নিজেদের মত আসছে যাচ্ছে । ভিতরে ঢুকে চশমার কাঁচ আঁচলে মুছে নিল নীল । বইপাড়ায় আজ বৃষ্টি হচ্ছে টিপটিপ করে । এতবছর পরেও তন্ময়কে পিছন থেকে দেখেই চিনতে পারল সে । কবছরে আরও যেন রোগা হয়ে গেছে তন্ময় ।

নীল: হঠাৎ সময়ে এসে পড়েছ ? হল কি তোমার ?

তন্ময়: এতবছর পরে প্রথম কথা — প্রথমেই খোঁচা ? যাক, তুমি বদলাওনি নীল । বাঁচালে ! সময়ে কোথায় ? সময়ের আগেই এসে পড়েছি ।

নীল হেসে ওঠে । সে হাসিতে পঞ্চাশ পার হয়েও উথালপাথাল তন্ময়ের মন ।

তন্ময়: হাসলে যে বড় ?

নীল: সময়েও নয় আর সময়ের আগেও নয় । দুজনেরই দেরী হয়ে গেছে ।

এবার তন্ময়ও হাসে । অন্যমনস্কভাবে মাথার রুপোলী চুলে হাত বোলায় । পুরনো, নতুন বইয়ের গন্ধে বাতাস ভারী । মাটির সোঁদা গন্ধও মিশে যায় তাতে । আদিম সেই গন্ধে বুকভরে একসঙ্গে শ্বাস নেয় দুজনে । অনেকদিন অসহ্য গরমের পর বৃষ্টি নেমেছে কলকাতায় ।

নীল: আমেরিকায় এরকম বৃষ্টি হয় না কেন বল তো ?

তন্ময়: তাহলে ওখানেও সকলে মেঘ বদলের কাব্যি লিখে ফেলত যে ।

নীল: আর বই কিনো না please.

তন্ময়: অসুবিধে কোথায় ? তোমার সঙ্গে অমন চমৎকার ঝোলা আছে দেখছি ।

নীল: তাতেই বা সুবিধে কি ? সে ঝোলাও তো প্রায় ভর্ত্তি দুজনের বইতে ।

নতুন কি লিখলে তুমি ?

তন্ময়: কিচ্ছু না ।

নীল: সে কি ? কেন ?

তন্ময়: এ প্রশ্নের উত্তর আমার থেকে তুমি ভাল জান নীল ।

নীল কিছুটা উদাস হয়ে যায় । তন্ময় সামলে নেয় । বলে, ‘লিখি না আমেরিকায় কলকাতার মত বৃষ্টি হয় না বলে ।’

নীল: এবারে বাড়ী চল।

তন্ময়: কাল আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতন যাবে ? লালামাটির বুকে বর্ষা দেখব দুজনে একসঙ্গে। পরশু ফিরে আসব। কিংবা তুমি চাইলে কালই।

তন্ময়ের প্রত্যাশী চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে নীল। বুকের মধ্যে ভাঙচুর চলে।

নীল: মাকে বলে দেখি।

তন্ময়: কেন, মা বকবেন বুঝি তোমাকে আমার সঙ্গে গেলে ?

নীল: ব্যঙ্গ করছ ? না গো। মায়ের আর বকাঝকা করার মত শক্তিও নেই, মনও নেই। আসলে বেশীক্ষণ একা থাকলে অসহায় বোধ করেন। তাছাড়া মার সঙ্গে সময় কাটাব বলেই তো সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ঘরে ফেরা।

তন্ময়: এই শেষ। আর কোনদিন তোমাকে আর কোন অসঙ্গত প্রস্তাব দেব না। রাখা না রাখা অবশ্য তোমার ব্যাপার।

নীল বোঝে এ সবই তন্ময়ের অভিমানের কথা। অভিমান তার বুকেও জমে আছে মেঘ হয়ে। জয় গোস্বামীর কবিতার বই ধরে থাকা তন্ময়ের হাতে অল্প চাপ দেয় নীল। চোখে ঝিলিক হেনে বলে, 'সেটাই তো কথা ছিল আমাদের। এ জন্মে শুধু প্রস্তাবের তালিকা তৈরী করা। আগামী জন্মে সে সব বিবেচনা হবে।'

তন্ময়: তোমার ও সব জন্মান্তরবাদের তত্ত্বে আমার আস্থা নেই নীল, তা তো তুমি জান নীল।

নীল: বেশ। রেখ না আস্থা। আসি এখন, কেমন ?

তন্ময়: একটু দাঁড়াও please.

নীল: আর দাঁড়ালে এবারে দোকানের মালিকই আমাদের বের করে দেবেন।

তন্ময়: বৃষ্টি হচ্ছে খুব। চল, আমি পৌঁছে দিই তোমাকে।

নীল: তুমি যাবে গোলপার্ক, আমি গিরিশ পার্ক। কিসের জন্য এতটা উল্টোপথ ধরবে তন্ময় ? আমি এগিয়ে পড়ি গো। অসুস্থ মা একা বাড়ীতে। অযথা চিন্তা করবেন।

এক ছুটে রাস্তা পার হয় নীল। মধ্যচল্লিশেও তার হাবভাব মেয়ের মতো। মন্থরতা আসেনি চলাফেরায়। বৃষ্টিছাটে ভিজছে গাছের মাথা, বাড়ীর ছাত। ট্যাক্সির সীটে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে নীল। জানালায় আছড়ে পড়ছে জলের ফোঁটা। তার সেলফোনে text message-এর সংকেত। চেনা নম্বর। গত পাঁচবছরের মতো না পড়ে delete করতে গিয়েও সে থমকাল। কি বলছে তন্ময় ? ছোট্ট বার্তা, 'অনেক বছর পরে একটা লাইন মাথায় এল — একটাই লাইন — হাপুস ধারায় ভিজছে এখন তোমার আমার সমস্তটাই — মেঘের ছায়ায় ঢাকছে খোয়াই, শালবন — কাল চল আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতন।' চোখ বন্ধ করে নীল। দ্বিতীয় সেতু ধরে ছুটে চলে ট্যাক্সি।

গল্প

যেবার পেলে এসেছিল

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

ছায়াপিসির মত পেলেভক্ত আমরা আর দুটো দেখিনি । অথচ ছায়াপিসি যে ফুটবল অত কিছু বোঝে তা নয় । মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল নিয়ে সেরকম কোন মাথা ব্যাথা নেই । বরং কেউ যদি বাইচুং ভুটিয়ার কথা তোলে, পিসি হাত নেড়ে ফুঁ ফুঁ করে উড়িয়ে দেবে ।

ধুরর ! ওকি পারবে পেলের মত হাজারখানা গোল করতে ? তোরা শুধু চেহারা দেখেই গলে যাস ।

পিসি পেলের খেলা দেখেছিল উনিশশো সাতাত্তরে, যখন কসমস আর মোহনবাগানের খেলা হয় ইডেন গার্ডেনসে । না, না মাঠে গিয়ে নয় । টিভিতে । তখন খেলা-টেলা দেখানো সবে শুরু হয়েছে দুরদর্শনে । পেলে আসবে বলে চারদিকে খুব হই চই চলেছিল, স্কুল কলেজ ছুটি ছিল যাতে সবাই খেলা দেখতে পারে ।

কিন্তু দেখবে কোথায় ? সেসময়ে খুব কম বাড়িতে টিভি থাকত । বাবা-কাকার মুখে শুনেছি আমাদের এলাকায় তখন টিভি ছিল হাতেগুনে ।

এক হাতে, শুধু এক হাতের চার আঙ্গুলে । দুহাতেরও দরকার নেই । হরেন দাসগুপ্ত, অনেককাল মারা গেছেন । কংগ্রেস করতেন । তার বাড়িতে একটা । সুশোভন মল্লিক, সিমেন্ট বালির আড়ত । তার ছিল আবার কালার টিভি, বিদেশী । আর হল মদন সাহার দাদার । মহা নচ্ছার লোক, কাউকে নিজের টিভি দেখতে দেবে না, এমন কি নিজের বাড়ির কাজের লোকটাকেও না । বলতে বলতে মুখ ঘৃণায় কুঁচকে যেতো ভটাদার । কিপটে হারামী, নাম নিলে হাঁড়ি ফাটে ।

তিনটে হল ভটাদা, ব্যাস ?

গ্লাসে চা ঢালতে ঢালতে ভটাদার হাত মুহূর্তের জন্য থামল । হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে — কল্যাণবাবুর বাড়িতে একটা টিভি ছিল, ওই যে রে তোদের ওই বন্ধুটা, মোটরসাইকেলে চড়ে এপাড়ায় হিড়িক দিতে আসে মাঝে মাঝে, বল না কি নাম ছ্যামড়াটার, ওরই দাদু ।

তাহলে লোকে দেখল কি করে ?

ওই ওখানেই, জানলা দিয়ে ঝুলে, দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, যে যেভাবে পারল । কিন্তু ছাড়েনি কেউ । সুবচনী মাসিমার শাশুড়ি, বয়স ছিল আশির ওপর । শুধু ভোট দিতে বাড়ি থেকে বেরুত । সেও লাঠি ঠুকঠুকিয়ে মল্লিকবাবুর বাড়ি হাজির । তবে মল্লিকবাবু দিলদরিয়া লোক ছিলেন । বাড়ির সামনে এত্ত বড় সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন, ডেকরেটার্সের থেকে শখানেক চেয়ার এনে পাতিয়ে দিলেন । আমি অবশ্য তখনও হাফপ্যান্টুল, তাই মাটিতে ।

তোমার তখন বয়স কত ভটাদা ?

হবে সে এক, কবে হল সেটা মনেও থাকে না ঠিকঠাক । সত্তরের শেষের দিকে না ? বারো চোদ্দ হবো বোধহয়, সবে এই চায়ের দোকানে কাজে লেগেছি ।

অথচ ছায়াপিসি উল্টো । তার সব দিনক্ষণের হিসেব ওই পেলের খেলাকে নিয়েই । নিজের জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস ঘাঁটতে হলেই আমাদের ছায়াপিসি বলত, ওইতো যেবার পেলে এসেছিল —

তুমি কবে স্কুল ফাইনাল দিয়েছিলে পিসি ?

ওই তো যেবার পেলে এসেছিল, তার চার বছর আগে।

তোমার কপালে ওই কাটা দাগটা কবে হল ?

ওটা তো পিসার দেওয়া।

আমরা একথা শুনে ঘৃণায় কুঁচকে উঠি — ছি ছি বলাপিসা এরকম ? ফেমিনিস্ট তনু টং করে বাজে — এইভাবে বিবাহিত নারীকে নির্যাতন, সম্পত্তি মনে করে নিজের ? আর তুমি ওই লোকটার সাথে এখনো টিকে গেছ ? পিসি হাঁ হাঁ করে উঠে বলবে — না রে না, এটা তো বিয়ের আগের। ওইতো যেবার পেলে এসেছিল, তার বাদের বছর। ফুটবল খেলা হচ্ছিল, আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোর পিসার কিক করা বল আমার কপালে।

তোমার সাথে পিসার বিয়েটা তবে হল কবে ?

এবার একগাল হেসে ছায়াপিসি বলত, ওই কপাল ফাটার পরের বছরই। ফাটা কপাল ওতেই তো জুড়ল।

ছায়াপিসিকে যখন থেকে দেখেছি, বড় হাসিখুশি মানুষ এক। সদা হাস্যমুখর ছায়াপিসির মুখ ঝকঝকে দাঁতের পাটিতে আলোকিত। এখন চুলে পাক ধরেছে একটু, কিন্তু ছায়াপিসির উজ্জ্বল চোখে এমন একটা সজীবতা থাকে। বলাপিসাও খুব আমুদে মানুষ। এমনিতে পার্টির হোলটাইমার। ছায়াপিসির যদিও স্কুল আছে। তবে তাতে আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। আর্থিকভাবে অবস্থাটা বেশ নীচের দিকে। কিন্তু পিসা আর পিসিকে দেখলে কোন কিছুর অভাব আছে বলে মনে হয় না। এমনকি নিঃসন্তান ছায়াপিসিকে বাচ্চা নিয়েও কোনদিন দুঃখ প্রকাশ করতে দেখিনি। বরং হেসে বলে, ভাগ্যিস নিজের নেই, না হলে এতগুলো বাচ্চার দায়িত্ব নিতে পারতাম ?

ছায়াপিসির বাড়ি আমার বাড়ির আট-দশটা বাড়ি বাদ দিয়ে। আমাদের দিকটাতে নয়, রাস্তার অন্য ফুটে। মাঝখানের সব বাড়ির সাথে যে আমাদের খুব যোগাযোগ তা নয়, কিন্তু ছায়াপিসিদের সাথে আমাদের বরাবর খুব যাতায়াত ছিল।

হবে না ? তখন তোর দাদু এখানে বাড়ি করলেন, কটা বাড়ি ছিল এখানে ? তার ঠিক বছর খানেক আগেই আমার বাবাও বাড়ি করে এখানে উঠে এসেছিলেন। মাঝখানের এইসব বাড়ি যা দেখিস, তার একটাও ছিল না। এসব তো উঠল পেলের খেলার বছর দশেক বাদে। তখন এ পাড়ায় লোক বলতে তোরা, আমরা আর ওই মোড়ের মাথার পাকড়াশিরা। তোর বাবাও তো জন্মাল এবাড়িতে এসেই। তার এক বছর বাদে আলো। সুবীর তার তিন বছর বাদে।

আলোপিসিকে আমি অত বেশী দেখিনি। দিল্লির কাছে কোথায় যেন থাকে। আমাদের বাড়িতে এসেছে বার দুই। টকটকে ফরসা গায়ের রং, টানা টানা চোখ —

যেন ঠিক দুগ্গাঠাকুরটি। মা যেন আমার মুখের কথা কেড়ে নিল। আর কি মিষ্টি ব্যবহার। আমি যখন দেখেছি সেও হবে আর না হোক ওর বিয়ের বছর পাঁচেক পর — আলোদি এক ছেলের মা তখন। তাও রূপ যেন ফেটে পড়ছে। ডাকসাইটে সুন্দরী ছিল এ তল্লাটের, তবে না এত ভাল বিয়ে হয়েছিল ?

তনু সাগ্রহে মাকে জিজ্ঞেস করেছে, বলো না মা আলো পিসির বিয়ের গল্প।

মা রোদে শুকিয়ে আনা আমসি শিশিতে তুলতে তুলতে হাত উল্টেছে, আমিই কি অত জানি, আমার কি বিয়ে হয়েছিল তখন ? ছায়াদির মুখেই শুনেছি, কার একটা বিয়েতে নাকি গিয়েছিল আলোদি। স্কুলে পড়া সেই মেয়েকে দেখে ওর হবু শ্বশুর ছেলের জন্য পছন্দ করে ফেলেছিলেন। কানপুরে চামড়ার কারখানা, বড়লোক। এখন তো আরও রমরমা অবস্থা, সুরেনদা তার বাবার ব্যবসাকে আরও কত বাড়িয়েছে। বিদেশে এক্সপোর্ট করে।

সব আলোর পয়ে। বড় মুখ করে বলে বড়দিদা, আলোপিসির মা। খুব পয়া ছিল ছোট্টবেলা থেকে। ও জন্মাল, তবে না ওনার অত বড় প্রোমোশনটা হল, দোতলাটা তুললাম। মেয়ে হলে মানুষের এমনটাই হওয়া উচিৎ।

বড়দিদার বয়স এখন আশির উপর। এখন ঝুঁকে গেছেন, তবে এককালে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন, বোঝা যায়।

ছায়াদিরা চার ভাই বোন। অধীর জেঠু সবার বড়। তারপর ছায়াপিসি, আলোপিসি। সবার ছোট সুধীরকাকু। অধীর জেঠুর এমনি লম্বা চওড়া চেহারা, টিকালো নাক, মোটা চশমার আড়াল থেকেও ধারালো চোখ নজর কাড়ে। এক সময় রাজপুত্রের মত চেহারা ছিল। দুর্গা পূজার যাত্রায় মেন রোলটা জেঠুর বাঁধা ছিল। কখনো চন্দ্রগুপ্ত, কোনবার সিরাজ। দরাজ গলায় মঞ্চের এক কোনা থেকে অন্য কোনায় দাপিয়ে বেড়াতো। এখন চুলে পাক ধরে বুড়ো রাজা। তবে যাত্রার করার আর সময় নেই জেঠুর, বড় চাকরি করে তো। অফিসের গাড়ি এসে নিয়ে যায়, ফেরে রাত করে। শনি রবিবার মাঝে মাঝে দেখি বাজারের দিকে যেতে, দেখা হলে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন, মানু, তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে ? ব্যাস, ওই অবধি। এছাড়া পুজোয় ফিতে কাটা ইত্যাদিতে পাড়ার মাথা হিসেবে ডাক পড়ে জেঠুর। পাড়ার বয়স্ক মহিলারা, বিশেষত যারা এই পাড়ার মেয়ে, বড় হয়েছে অধীর জেঠুর কাছ সময়ে, এখন হয়তো পুজোয় বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে, জেঠুকে দেখলে গলে পড়ে। আমার বন্ধু সুব্রতর গলুপিসি নাকি কম বয়সে জেঠুর প্রেমে লাট্টু ছিল। সুব্রতর মুখেই শোনা — কিন্তু পাত্তা পায়নি। লাইন অনেক লম্বা ছিল যে। জেঠুও সে সময়ের রীতি অনুযায়ী সম্বন্ধ করে বিয়ে করেছিলেন। সুনু জেঠিমাও কিছু কম রূপসী নন। ওদের ছেলে রূপেশ, যেন সিনেমার হিরো। ওর সাথে অবশ্য অত যোগাযোগ নেই। এখানে তো অত ভাল স্কুল নেই। তাই হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে ছোটবেলা থেকে। মোটের উপর অধীর জেঠুর যাকে বলে সফল জীবন।

দাদার কথা বলতে বলতে ছায়াপিসির চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। ওরে বাবা, দাদা পড়াশোনায় কি ছিল। আর চাকরি করে কত বড়। নেহাত জায়গাটাকে ভালবেসে এখানে থেকে গেল। নাহলে হিল্লিদিল্লি থাকার কথা ওর। বৌদি তো ছেলেকে এই জন্যেই বাইরে বাইরে মানুষ করছে, যাতে এই গন্ডির মধ্যে আটকে না পড়ে।

ছায়া পিসির বিষয়ে অধীর জেঠুদের অভিমতটা অত দরাজ নয় যদিও। ছোটবেলায় একবার আমাদের বাড়িতে রাতের খাবারে জেঠু আর সুনু জেঠিকে ডাকা হয়েছিল। খেতে খেতে গল্প চলছিল। আমি আর বোনও ছিলাম। তখন সবে বড়দের সাথে এক টেবিলে বসে খাবার মর্যাদা অর্জন করেছি। রূপেশ তো ছিল না। কিন্তু রূপেশের হস্টেলে থেকে পড়া নিয়ে কথা শুরু হয়ে আমাদের সকলের পড়াশোনা, বেড়ে ওঠার সময়ে অধ্যাবসায়ের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অভিভাবক জনিত আলোচনায় গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমরা ছোটরা এইসব সিরিয়াস কথার সময়ে মাথা নিচু করে মাংস আর পোলাও খেতে ব্যস্ত হয়েছিলাম। পাঁঠার নলিতে সুরুত করে টান দিয়ে জেঠু গড়ান কথাকে লম্বা শট লাগালেন — দেখ না সময়ে পড়াশোনায় মন দিলে ছায়াটার আজ এই অবস্থা হয় ? এই রকম বাড়ির মেয়ে হয়ে, জীবনটাকে নিয়ে কি করল ছায়া ? শুনু জেঠিও আলটপকা বলে বসল, যাই বল, আজকালকার দিনে কে আর এমন ঘরজামাই থাকে ? বিয়ের পর বাপের বাড়িতে থাকা — শেষ করেনি জেঠি, কিন্তু কেমন একটা ছি ছি ভাব জড়িয়ে গেছিল কথাটার আষ্টেপৃষ্টে। আমার মা ছায়া পিসিকে খুব পছন্দ করত। তাই বলবে না বলবে না করেও বলে ফেলল, কিন্তু কত ভাল একটা কাজ করছে ছায়াদি আর বলরামদা ? অনাথ আর গরীবদের নিয়ে এমন একটা স্কুল চালায়, কে করে আজকালকার দিনে ?

জেঠু গম্ভীরমুখে বলল, টাকাটা কোথা থেকে পায় এই স্কুল চালাতে, সেটা একবার খোঁজ নিও।

জেঠি খড় খড় করে উঠল, আবার বলে কিনা একতলায় এতগুলো ঘর ফাঁকা পড়ে আছে, কটা অনাথ বাচ্চার থাকার জায়গা নেই। রাখি দিদি ?

মা কিছু হয়তো বলতো, কিন্তু অবস্থা বেগতিক হয়ে যাচ্ছে দেখে বাবা মাঝখান থেকে বলে উঠল, এই জায়গাটার উন্নয়নে তোমাদের পরিবারের তো কম দান নেই অধীরদা। কেন, তুমি না পাশে থাকলে এই ক্লাবঘরটা আমার দাঁড় করাতে পারতাম ?

অধীর জেঠুর কুঁচকানো ভুরু এবার স্মিত হাসিতে ছড়িয়ে গেছিল — না, না পাড়ার ছেলেগুলোর জন্য এইটুকু তো করতেই হয়।

ওরা চলে গেলে বাবা মাকে খুব বকেছিলেন, ওদের পারিবারিক ব্যাপারে তোমার ঢোকার কি দরকার ?

আমরাও খুব অবাক হয়েছিলাম জেঠুর কথায়। এই স্কুলের জন্য ছায়াপিসি তার আগের বছরেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে পদক পেয়েছিল, যে কোন নাগরিক সমস্যায় ছায়াপিসির প্রথম ডাক পড়ে তখনই, অথচ জেঠু —

ওদিকে সুধীর কাকু আবার তার দিদিকে খুব ভালবাসত। সুধীর কাকুও তার বাবা আর দাদার মত লম্বা চওড়া ফরসা। এখন আবার বিদেশে থেকে থেকে সেই রংটা আরও লালচে হয়েছে। চুলটা সোনালী হলে সাহেব ছাড়া কেউ ভাববে না। তবে কাকুর ছেলে মেয়ের চুল সোনালীই, একটু বাদামী ঘেঁষা। কাকুর বউ বেথ আমেরিকান তো। বোস্টনে পড়ার সময়েই প্রেম ও বিয়ে। এখন থাকে সানফ্রান্সিসকো।

সুধীরকাকুকে আমরাও খুব ভালবাসতাম। এখন তো খুব কম আসে, কিন্তু আগে যখন আসতো আমাদের বসার ঘরে বসে হাসলে, মোড়ের মাথায় শোনা যেতো। ছায়াপিসির কাছেই শুনেছি যে সুধীরকাকু শুরুতে নিজে তো হেল্প করেছিলই, এমন কি বিদেশে লোকেদের কাছ থেকে ডোনেশনও পাইয়ে দিয়েছে স্কুলের জন্য।

সরকারী গ্র্যান্ট কি আর পাওয়া যায় ? আমার ভাইবোনেরা ছিল বলেই না এসব কিছু করতে পারছি। তা না হলে ওই মানুষটা তো পার্টির কাজ ছেড়ে কিছু কখনো করেনি, করবেও না। ছায়াপিসির অকপট স্বীকারোক্তি। ভালো তো আলোপিসিও বাসত। কিন্তু বয়সে ছোট হলেও সে ভালোবাসায় লুকিয়ে থাকতো জ্যেষ্ঠার কর্তৃত্ব, সাফল্যের অভিমান।

যেমন আলোপিসি মাকে বলবে — আর বলো না প্রতিমা, দিদিটা এত ভাল, এখনো সেই আলাভোলাই রয়ে গেল। লোকে ওকে নাকের উপর দিয়ে ঠকিয়ে নিয়ে চলে যাবে, ওর হুঁশ হবে না।

মা বলবে, কিন্তু আলোদি, এমন ভালো লোকের ও তো দরকার। দেখোনা সবার বিপদে ছায়াদির প্রথম ডাক পড়ে। আমরা সবাই সেয়ানা আর নিজ-বুঝ, মাঝখানে অন্তত একটা এমন লোক থাকলে তো আয়নার কাজ দেয়।

আলোপিসির পবিত্র দেবীপ্রতিম মুখে বেদনার ছায়া খেলে যায় হঠাৎ — কেন প্রতিমা, আমাকে সেয়ানা বলে মনে হয় ? আমি জানি দিদির আগে আমায় বিয়ে হয়েছিল বলে আমাকে লোকে স্বার্থপর আর কি কি জানি সব বলে। কিন্তু আমার চেহারা কি আমার হাতে ? কি বয়স ছিল আমার তখন, স্কুলের শেষ পরীক্ষার বছর। বাবা মা ছেলের বাড়ির বিরাট অবস্থা দেখে না করতে পারল না। আমি কি করতাম ? কেন দিদি তোমাকে কিছু বলেছে ?

না, না ছি ছি আলোদি, আমি কি সেটা বলেছি ? আর ছায়াদিকে তুমি জানো। তোমাদের প্রতিটা ভাইবোন অন্ত প্রাণ ওর। তোমার সম্বন্ধে ভাল ছাড়া মন্দ কখনো শুনিনি।

নাগো, জানি দিদির কষ্ট হয়েছিল। আস্তে আস্তে বলছিল আলোপিসি। আমি দিদিকে একা একা কাঁদতে দেখেছি। দিদিকে বলেছি, আমি না করে দিই দিদি ? দিদিই আমাকে উলটে বলল — নারে আলো, এটা তো আনন্দের চোখের জল। আমি তো দুঃখেও কাঁদি আর আনন্দেও কাঁদি, ওই আমার দোষ। কি জানি কোনটা সত্যি, কোনটাই বা মিথ্যা। হয়তো ওই কাঁচা বয়সে আমিও নিজের বিয়েতে মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, হ্যাঁ সত্যি তো, দিদির তো কথায় কথায় এমন জানলার বাইরে তাকিয়ে কাঁদার অভ্যাস সেই ছোটবেলা থেকে। আসলে দিদি অনুভূতিপ্রবণ, মায়ায় ঘেরা এক, মানুষ।

আমি কিন্তু ছায়াপিসিকে কখনো কাঁদতে দেখিনি। অন্যের কান্না মোছানোর জন্যে বরং চরকির মত ঘুরছে। শুধু তাই নয় আমাদের জন্য ছায়াপিসি মানেই হাসি, মজার মজার কথা, এক অন্তরঙ্গ ভালবাসা। আমার নিজের তো পিসি ছিল না, ছায়াপিসিকেই পিসি বলে পেয়েছি। পিসি যেমন আমাদের কষ্টে বুকে টেনে নিয়েছে, তেমনি আবার আমাদের শক্ত হতে

শিখিয়েছে। বলেছে, কখনো নিজেকে ছোট বা কমজোর মনে করবি না। এই পৃথিবীকে আমাদের সবার অনেক কিছু দেবার আছে, পাবার আছে। ছায়াপিসি এসব বললে আমাদের জ্ঞান দেওয়া হতো না। বোধহয় আমাদের সাথে মিশে যাবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলে। তাই আমরা মানে আমি আর তনু পিসিকে অনেক কথাও খুব সহজে বলতে পারতাম। এমনিভাবেই কথাটা উঠেছিল। তনু বোধহয় তখন কলেজে জাস্ট ঢুকেছে আর ওর কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখার খবর মার কানে কিভাবে এসে পৌঁছেছে। এর আগে আগেই তনুর এইচ এস খুব বাজে হয়েছিল। মা বোধহয় তাই বলেছিল, দ্যাখ দাদাকে দেখে শেখ। আমার ছেলে আমার মাথা কোথায় তুলে দিল আর তুই পাস করলি ঘষটে ঘষটে।

তনু কিছু বলতে গেল তাতে রেগে গিয়ে মা আরও ঝাঁপিয়ে পড়ল, ধিঙ্গিপনা কমাও এবার। এইতো রূপের বাহার, রোদে পুড়ে রূপ আরও খুলছে। তার উপর লেখাপড়ায় লবডঙ্কা। কোন ছেলে ঘুরেও তাকাবে আর ?

তনুর মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছিল। ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, পিসি ওকে জড়িয়ে ধরে মাকে বকেছিল, এমনভাবে বলো না প্রতিমা। আর কারো তাকানো না তাকানোতে কি তনু কম বেশি হয়ে গেল ? তাছাড়া হাতের পাঁচটা আঙ্গুল তো সমান হয় না। সমান হলে হাতের কি কাজটা হত ?

পিসির মাঝখানে পড়াটা মার মনে ধরে নি। সমান তো চাইনি দিদি, কিন্তু ছুরি দিয়ে কেটে আঙ্গুল ছোট করারও তো দরকার নেই। বলে মা চলে গেল।

পিসির বুকে মুখ গুঁজে ফোঁপাচ্ছিল তনু। পিসি ওর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, একটা কথা কিন্তু তোর মা ঠিকই বলেছে। চেষ্টা মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। কেন ধরে রেখেছিস তুই ভাল করতে পারবি না ?

সব কথায় দাদা এই, দাদা সেই — আমি কি কিছুই না। কাঁদতে কাদতেই বলছিল তনু। তখনই হঠাৎ ও এই প্রশ্নটা করেছিল, হ্যাঁগো পিসি, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

বাবারে বাবা, দেখা হলেই তো কথা বলে বলে কানের পোকা নড়িয়ে দিস, টিকেট কেটে প্রশ্ন করার অভ্যাস আবার কবে হল তোদের ?

তনু কিন্তু কিন্তু করছিল, মানে ভাবছিলাম, তোমার কষ্ট হত না ? তোমার ভাই বোনেরা সবাই এত বড় বড় চাকরি ব্যবসা —

ছায়াপিসি মুখের কথা কেড়ে নিল, শুধু তাই কেন বল, এমন এক রাজপুত্র রাজকন্যার বাড়িতে তুমি যেন ঘুঁটে কুড়োনি —

ছি পিসি, আমি কি তাই বলেছি নাকি ? কিন্তু ভাবি কম বয়সে, কেউ কিছু বলত কি ? তারপর তোমাকে ছেড়ে আলোপিসির বিয়ে হয়ে গেল, যখন হয়তো তোমার বিয়ের বয়স —

ওমা দেখো এই মেয়েকে ! এই সেদিন ও বারান্দায় খড়ির দাগের গন্ডী কেটে দিয়ে গেলে, তার বাইরে পা বাড়াত না। আর এখন বুড়ি পিসিকে কিসব প্রশ্ন করছে। তনুর লাজুক চিবুক ধরে নেড়ে দিল পিসি। দম নিল একবার। হঠাৎ সেই বিয়ের কথা ? কেন রে তনু ?

আমি বলে উঠলাম, জানো না তনু প্রেমে পড়েছে, বিয়ে করবে। আমি কষ্ট পাবো কিনা সেটা নিয়ে ভাবছে।

ধ্যাত দাদা, তুই না — অকারণেই লজ্জায় লাল হয় তনু।

ছেলেদের হয় না, কিন্তু মেয়েদের হয় রে। আমার ও হয়েছিল, মিথ্যা বলবো না। যেবার পেলে এসেছিল, সেই বছরে আলোর বিয়ে ঠিক হল। মনে হয়েছিল বাবা মা এটা কেন করছে। আলোর তো বয়স কম ছিল, এত সুন্দর। ওর কি বিয়ে

আটকে থাকতো ? অথচ তখন আমার জীবনে কিচ্ছু ছিলনা । না ছিলাম দেখতে সুন্দর । পড়াশোনাও বিশেষ কিছু না । সবেতেই পিছিয়ে পড়া মেয়ে । ভাবলাম আবার কি পিছিয়ে গেলাম ? চারিদিকটা অন্ধকার দেখছিলাম । রাগ হচ্ছিল নিজের উপর, নিজের ভাগ্যের উপর ।

শুধু রাগ না, নিজের জন্য খুব কষ্টও হচ্ছিল রে । সারা জীবন শুধু শুনে গেছি অধীর-সুধীর আলোর পাশে ছায়া যেন বেমানান । একই মায়ের পেটের বলে মনেই হয় না । আমি মাকে জিজ্ঞেস করতাম, আমাকে কি তোমরা মেলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলে মা ? মা বাবাও যে আমাকে রকমফের করেছে তা নয় । ছোটবেলায় কতদিন স্কুল থেকে এসেছি কাঁদতে কাঁদতে, কালো বলে আমাকে বাচ্চারা হয়তো হজমি গুলি বলে খেপিয়েছে । মা সান্তনা দিত, এরপর যদি কেউ এমন বলে, বলবি কালো জগতের আলো, ফরসা গুয়ের মালসা । তখনকার মত আমার কান্না থেমেছে, কিন্তু আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীর কথা কোনদিন থামে নি । আমার মনে হচ্ছিল, ওরা আলোর বিয়েতে রাজী হয়ে গিয়ে আমাকে আর ও বেশি করে এইসব কথা শোনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে । আমি দেখতে পাচ্ছিলাম বিয়ে বাড়ি, একঘর লোক, সবাই আনন্দ করছে আর আমাকে দেখলেই থমকে যাচ্ছে । কেউ হয়তো আড়ালে বলছে, আহা অনিল-রমার এই মেয়েটা যেন চাঁদের গায়ে কলঙ্ক । কিম্বা রংটা এতো চাপা, অন্য দিকেও তেমন কিছু — । নিজেই ভাবছিলাম, ভেবে ভেবে কেঁপে উঠছিলাম । বুঝতে পারছিলাম, এমন একটা ব্যাপার ফেস করার ক্ষমতা আমার নেই । এতগুলো কথা একবারে বলে এবার থামল ছায়াপিসি ।

কি করলে তখন ?

কাউকে কখনো বলিনি এটা । তোদের বলি । আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে মরবো, গলায় দড়ি দেবো বা রেললাইনে ঝাঁপাবো । হাসছি, খেলছি, মা আর আলোর সাথে বিয়ের বাজার করছি । কিন্তু মনে মনে তৈরী হচ্ছিলাম । সাহস জোগাড় করছিলাম ।

কতদিন আগের কথা, আজ তোদের কেন বলছি জানিস ? ছায়াপিসি আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসছিল । যাতে তোরা কখনো এমন না করিস । এটা ভুল, এটা বিনা কারণে হেরে যাওয়া । তনু পিসির গলা জড়িয়ে ধরেছিল । ও ছায়াপিসিকে সত্যি খুব ভালবাসত । পিসি হেসে উঠল, আরে আরে আমি তো আর সত্যিই মরে যাইনি রে পাগলি । কেমন জলজ্যান্ত তোদের সামনে বসে আছি, দ্যাখ ।

তুমি এর থেকে নিজেকে সামলালে কি করে পিসি ?

এবার মুচকি হাসে পিসি । পেলে, আমার পেলেই আমাকে বাঁচিয়ে দিল ।

সেটা কেমন করে পিসি ? পিসির পেলেপ্রীতি আমাদের জানা ছিল । কিন্তু তার সাথে যে পিসির জীবনের এত বড় যোগ আছে সেটা তো জানা ছিল না ।

আঠেরই অক্টোবর, উনিশ শো সাতাত্তর । পরের দিন আলোর আশীর্বাদ, ছেলে পক্ষ থেকে আসবে । বাড়িতে তাই সাজ সাজ রব । আমিও সব কিছুতে হাত লাগিয়েছিলাম, কিন্তু বুকের ভিতর একটা কান্নার বাঁশিও যে বাজছিল । কোনার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে একটু কেঁদে নিচ্ছিলাম । মা দেখতে পেয়ে খুব রেগে গেল । আমার উপর চেঁচিয়ে উঠল, অলক্ষী, শুভদিনে কেঁদে ভাসাচ্ছিস বাড়িতে ? কেন খুব বুঝি বিয়ের শখ হয়েছে ? দেখেছিস নিজের চেহারাটা ? এইসব আরও কি কি বলেছিল । মা আমার চোখের জল দেখল, চোখের ভাষা বুঝল না । আমার কষ্টটা একবার ও অনুভব করল না । কেমন পাগল পাগল লাগছিল । অপমানে, কষ্টে গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরলো না । কিছু না বলে পায়ে চটি গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম । বুঝতে পেরেছিলাম, আজকেই সেই দিন । হন হন করে রেল লাইনের দিকে হাঁটা দিয়েছিলাম । কান দিয়ে হলকা দিচ্ছিল যেন, চোখে মুখে অন্ধকার দেখছিলাম । তাই আমি দেখিনি, হঠাৎ দেখি ভাই ডাকছে । কিরে দিদি, তুইও খেলা দেখতে যাচ্ছিস ?

খেলা ? কিসের খেলা ? আমার মাথা তখন সম্পূর্ণ অন্য জায়গায় ।

ওকিরে বড়দি, পেলে এসেছে না ? ভাই তখন স্কুলে পড়ে, চোখদুটো উত্তেজনায় চকচক করছিল । ও প্রায় আমাকে দুহাত ধরে টেনেই ধরল, চল মল্লিক জেঠুদের ওখানে সামিয়ানা খাটিয়েছে । ওখানে ভাল করে দেখা যাবে ।

পেলের নাম ওর মুখে কদিন ধরে খুব শুনছিলাম, ফুটবল খেলে এইটুকু জেনেছিলাম, ব্যাস ! ভাবলাম আজকেই তো সব শেষ, আহা ভাইটা আমার ! না হয় ওর মন রাখলাম । ভাইয়ের সাথে সাথে গেলাম । মল্লিকজেঠুদের ওখানে বেশ ভিড় জমেছিল, তবু কোনার দিকে বসার জায়গা পেয়ে গেলাম । ভাই কানের কাছে পেলের গুণকীর্তণ করে যাচ্ছিল । আমার তখন যা মনের অবস্থা, এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরুচ্ছে । ভাবছিলাম খেলা শুরু হলে সুট করে বেরিয়ে যাবো ।

এমন সময় টিভির পর্দায় মহা আলোড়ন । সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল এই সামিয়ানার তলায় । চারদিকে গুঞ্জন — পেলে, পেলে । উত্তেজিত গলায় ভাই বলল, ওই পেলে আসছে ।

ক্লান্ত চোখে দেখলাম টিভির পর্দায় দেখাচ্ছে সাদা জার্সি পরে বিদেশী খেলোয়াড়দের দল মাঠে নামছে । ক্যামেরা জুম করল একজনের উপরে, টিভির পর্দায় ক্যাপসান এলো এডওয়ার্ড ডু নাসিমান্টো । ভাই কানের কাছে ফিসফিস করল, এটাই পেলে রে দিদি ? আমি যা অবাক হলাম না ! এই তোদের পেলে ? কুচকুচে কালো, বেঁটে আর মুখটা যেন মানুষের পূর্ব পুরুষগোত্রীয় । পেলে একবার স্টেডিয়ামের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল, আর মাঠে সেকি উত্তাল গর্জন । এক এক করে আর সব প্লেয়ারকেও দেখাল, তারাও হাত নাড়ল । একেকজনকে দেখাচ্ছিল আর আমি অবাক হচ্ছিলাম । লম্বা, ফরসা — কারো সোনালী চুল কারো বা লাল । ভাই বলছিল ওরাও সবাই নাকি বড় বড় প্লেয়ার । কিন্তু ওই সবার মাঝে লোকে শুধু চেঁচাচ্ছে পেলে, পেলে । আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলাম । ফুটবল খেলার তখন কিচ্ছু বুঝতাম না । কিন্তু তবু নড়তে পারলাম না । আমার ট্রেন লাইনে গিয়ে সুইসাইড করা আটকে গেল । আমি শুধু দুচোখ ভরে পেলেকে দেখতে লাগলাম । আমি দেখলাম অতগুলো লালমুখো সোনালী চুলের সাহেবকে ছেড়ে সবাই শুধু কৃষ্ণ নাম জপের মত পেলে পেলে করে গেল । পেলে সেদিন কেমন খেলেছিল, কি করেছিল আমি জানিও না, বুঝিও নি । শুধু এইটুকু বুঝেছিলাম যে শুধু নিজের কেরামতিতে তার চারপাশের যত তাবড় তাবড় হিরোদের মাথা ছাড়িয়ে কোথায় উঠে গেছে লোকটা । তাকে কেউ কালো-কুচ্ছিত ভাবছে না আর, উল্টে সুন্দরের ডেফিনিশনটাই যেন বদলে দিয়েছে । ভাবলাম, তাহলে আমি নই কেন ? আমি কেন গুমরে মরছি, কেন খেলা শুরুর আগেই নিজেকে হারিয়ে বসে আছি ? আত্মহত্যা আর করা হল না, তবে বোকা ছায়াটা মরেছিল সেদিন । আর তোদের এই ছায়াপিসির আসল জীবনটারও সেই শুরু ।

ছায়া পিসির চোখের কোল চিকচিক করছিল । শুধু একটাই দুঃখ, কেন আর একটু কম বয়সে এল না ।

আমি বললাম, ঠিক বলেছ পিসি, পেলে যখন এসেছিল ওর বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে । ততদিনে নির্ঘাত ওর খেলা পড়ে গেছিল ।

জানলার বাইরে সন্ধ্যে নামছিল । শেষ সূর্যের আলোর আভায় উদ্ভাসিত পিসি উল্টো হাতে চোখে মুছে স্বভাবচিত মুচকি হেসে বলল, ধুর ! আমার কম বয়সের কথা বলছি রে পাগল ।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় লেখক । প্রধানত গল্পকার, ইদানীং নাটকও লিখছেন । গল্প প্রকাশিত হয়েছে দেশ, বর্তমান, সানন্দা, কথা সোপান, দুকুল এবং আরও পত্রপত্রিকায়, এবার বাতায়নে । মঞ্চসফল নাটক ‘রণাঙ্গন’ — এই বছরে বেশ কয়েকবার মঞ্চে এসেছে । ধারাবাহিক উপন্যাস ‘হাগা সাহেবের ট্রেন’ প্রকাশ পাচ্ছে অন্যদেশ ওয়েবজিনে । থাকেন অ্যান আরবার, মিশিগানে ।

অনুগল্প

একটি ছোট্ট আধুনিক নারীবাদী রূপকথা

ধীমান চক্রবর্তী

এক যে ছিল দেশ, সে দেশে এক যে ছিল রাণী, আর সেই রাণীর এক যে ছিল কন্যা। একদিন স্কুল থেকে ফিরে Pokemon Go খুলে সেই রাণীকন্যা জানতে পারল যে পাশের এক প্রতিবেশী রাজ্যে এক অপরূপ সুন্দর রাণীপুত্রের বাস। সেই রাণীপুত্র কি কারণে যেন ঘুমিয়ে আছে এবং তাকে জাগাতে হ'লে কোন রাক্ষসীকে ঘুষ খাইয়ে কি সব সোনা রুপোর কাঠি-ফাঠির বন্দোবস্ত করতে হবে। রাণীকন্যা ভাবল, ব্যাপারটা একটু খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। দশ মিনিটের মধ্যে রাণীকন্যা তার সহচরী মন্ত্রীকন্যা, কোটালকন্যা, বণিককন্যা, IT consultant কন্যা, মায় অধ্যাপিকা কন্যা – সবাইকে জুটিয়ে নিয়ে মায়ের garage থেকে ঝাঁ-নতুন লাল পক্ষীরাজ Tesla SUV টি (fully electric, zero emission) নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেই রাণীপুত্রের সন্ধানে। পথে কত যে stop sign আর traffic light পড়ল, তার ইয়ত্তা নেই। পড়ল দশটা McDonald's, পাঁচটা Burger King, তিনটে Pizza Hut, দু'টো KFC আর একটা toll booth ও। সে সব মাড়িয়ে, ছাড়িয়ে, গুঁড়িয়ে, পুড়িয়ে, উড়িয়ে, কুড়িয়ে যখন তারা সেই প্রতিবেশী রাজ্যের রাণীপুরীতে গিয়ে পৌঁছল, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমেছে। রাণীপুত্রের মা, যিনি কিনা আরেক রাণী, তিনি প্রাসাদে ছিলেন না। মৃগয়া করতে সেই যে ভোরবেলা বেরিয়েছেন, তখনও ফেরেননি। রাণীপুত্রের বাবা যে রাজা, তিনি ঘরে ব'সে সংসার আগলান, ফোন-টোন এলে ধরেন, আর এসবের ফাঁকে ফাঁকে facebook এ টহল মারেন। রাজামশাই ফটক খুলে উদাস ভাবে জানালেন যে রাণীপুত্রের ঘুমিয়ে থাকার গুজবটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। সে ভীষণভাবে জেগে আছে এবং Pokemon Go নিয়ে সেও কোথায় চরতে বেরিয়ে গেছে। ''যাক মা, বাঁচা গেল, আর ফালতু ঐসব রাক্ষসী-খোক্কসীদের মহড়া নিতে হবে না'', এই ব'লে রাণীকন্যা আর তার দলবল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, রাজাকে ধন্যবাদ ও বিদায় জানিয়ে, অন্ধকার হওয়ার আগেই নিজেদের রাজ্যে যে যার বাড়িতে ফিরে গেল এবং পরদিন যে সমস্ত Homework assignment due ছিল, সেগুলো করতে ব'সে পড়ল।

অনুগল্প

মেঘ বালিকা

মীরা চ্যাটার্জী

আকাশের মুখে হাসি, আবার তার গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা তার প্রতি বছরই হয়। তবু প্রতিবারই এক অনির্বচনীয় আনন্দে সে সম্পৃক্ত হয়।

কি সুন্দর তুলোর মত ফুরফুরে সাদা মেঘ সন্তানরা তার কোলে খেলা করে। কিন্তু আকাশের সদাই ভয় পৃথিবীকে। ঐ মায়াময়, মোহময়ী পৃথিবীর হাতছানিতে প্রতি বছরই যৌবন প্রাপ্তা মেঘবালিকারা তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বেই।

তাই মেঘবালিকারা একটু নামলেই আকাশ মায়ের মুখ কালো হয়। কিন্তু মায়ের ডাক অমান্য করে, বিদ্যুৎ মাসীর অগ্নিচক্ষু ভ্রুকুটি আর বজ্র ভাই-এর তর্জন গর্জন উপেক্ষা করে মেঘবালিকারা বৃষ্টি হয়ে নেমে আসবেই। শুনতে পাচ্ছ না ডাক — ''আয় বৃষ্টি ঝেঁপে'' — তাই শুভদিনে শুভক্ষণে পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঘ। বৃষ্টির শীতল ধারায় বিরহতপ্ত পৃথিবী তৃপ্ত হয়। সম্পৃক্ত হয়। পৃথিবীতে নতুন বীজ বপন পর্ব শুরু হয়।

আর মেঘ ? তৃপ্ত মেঘ নদী, সমুদ্রে মিশে অপেক্ষা করে সেই দিনের জন্যে, যেদিন আবার তারা মায়ের কোলে ফিরে যাবে। আবার বাষ্প হয়ে মার গর্ভে আশ্রয় পাবে। মেঘ হয়ে খেলা করবে আকাশ মায়ের কোলে। আর ? আর অপেক্ষা করবে সেই ডাকটার জন্যে —

''আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।''

মীরা চ্যাটার্জী — কলকাতার বাসিন্দা। জীবনের শুরু থেকে নানা ধরণের হস্তশিল্পে পারদর্শিতা দিয়ে যে শিল্পপ্রীতির উন্মেষ তার রেশ পরবর্তী পর্যায়ের গৃহস্থালী আর নানা পারিবারিক দায়িত্বে সুপ্ত থাকলেও হারিয়ে যায়নি। এখন প্রৌড়ত্বের অবকাশে তাঁর নিজের একান্ত ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনার সাথে আবার সংযোগের ইচ্ছার ফল এই প্রচেষ্টা।

নাটক

অলৌকিক

সুদীপ্ত ভৌমিক

(শহরতলির সন্ধ্যে। একটি নির্জন রাস্তা। একজন দুজন পথচারী মাঝে মধ্যে হেঁটে চলে যাচ্ছে। পথের ধারে সনাতন বাগচি দাঁড়িয়ে, চোখ মাটির দিকে। খুব নিবিষ্ট মনে কিছু দেখছেন, অথবা কিছুর জন্য অপেক্ষা করছেন। মিহির চৌধুরী পথ দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। সনাতনকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ লক্ষ করে, সনাতনের দিকে এগিয়ে এলেন।)

মিহির ঃ কি ব্যাপার সনাতন ? কি দেখছ ?

সনাতন ঃ এখুনি উঠবে ?

মিহির ঃ উঠবে ? কি উঠবে ?

সনাতন ঃ দেখতে পাবেন। একটু অপেক্ষা করুন। কটা বাজে ?

মিহির ঃ (ঘড়ি দেখে) সাড়ে সাতটা।

সনাতন ঃ তাহলে আর বড়জোর দশ মিনিট।

মিহির ঃ কি আশ্চর্য। বলবে তো কি উঠবে ? গাছ ? নাকি জল ? মাঝে মাঝে জলের পাইপ ফাটলে - কিন্তু এখানে তো জলের পাইপ আছে বলে জানিনা। ম্যানহোল ও নেই।

সনাতন ঃ নানা সেসব কিছু নয়।

মিহির ঃ তাহলে ?

সনাতন ঃ বিগ্রহ উঠবে। রাধা গোবিন্দের বিগ্রহ।

মিহির ঃ অ্যাঁয় ! সেকি ? রাধা গোবিন্দের মূর্তি এই রাস্তার মাঝখানে উঠবে ? মানে মাটি ফুঁড়ে উঠবে ?

সনাতন ঃ হ্যাঁ উঠবে। পিতলের মূর্তি। দেড় ফুট উঁচু। ওজন প্রায় দুই কিলো।

মিহির ঃ এই সনাতন, তুমি গাঁজা টাজা খেয়েছ নাকি ?

সনাতন ঃ না দাদা। আপনি জানেন আমি নেশা ভাঙ করিনা। কোনদিন করিনি।

মিহির ঃ তাহলে এই সব উল্টো পাল্টা কথা বলছ কেন ? চল চল বাড়ি চল। তোমার বউ অপেক্ষা করে আছে।

সনাতন ঃ না অপেক্ষা করছে না। বউ জানে।

মিহির ঃ সনাতন এসব তোমার মাথায় কে ঢুকিয়েছে বলত ? এটা একবিংশ শতাব্দী। আজকাল এসব অলৌকিক ঘটনা ঘটে না। তোমাকে কেউ নিশ্চয়ই বোকা বানাবার চেষ্টা করছে।

সনাতন ঃ কেউ মাথায় ঢোকায়নি দাদা। কেউ বোকা বানাচ্ছে না। আমি নিজে স্বপ্নাদেশ পেয়েছি।

(ইতিমধ্যে তনিমা এদের দুজনকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে।)

তনিমা ঃ কি ব্যাপার মিহিরদা ? মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনারা কি করছেন ?

মিহির ঃ এই যে তনিমা, সনাতন কি বলছে শোন। হ্যাঁ সনাতন, স্বপ্নে কি পেয়েছো বললে ?

সনাতন ঃ স্বপ্নাদেশ পেয়েছি। মাধব এসে আমাকে বললেন —

তনিমা ঃ মাধব ? কোন মাধব ? মুখার্জী পাড়ার মাধব ?

সনাতন ঃ না ! মাধব — অর্থাৎ গোবিন্দ, অর্থাৎ শ্রী কৃষ্ণ।

মিহির ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। কি বললেন মাধব ?

সনাতন ঃ বললেন, ওরে সনাতন, আগামীকাল সন্ধ্যে সাতটা চল্লিশ মিনিট গতে, সাকিয়ারির রাস্তায়, হেলা বটতলা থেকে ঠিক পঞ্চাশ গজ উত্তরে আমার মূর্তি — ঠিক আমার নয়, আমার আর রাধার যুগল পিতলের মূর্তি পাতাল ফুঁড়ে আবির্ভূত হবে।

তনিমা ঃ সেকি কথা ?

মিহির ঃ বোঝ কান্ড। মূর্তির হাইট, ওয়েট এসব ও নাকি বলে দিয়েছেন।

তনিমা ঃ সময় তো প্রায় হয়ে এল। মাধব স্বপ্নে তোমাকে আর কি বলেছে সনাতনদা ?

সনাতন ঃ বলেছেন, মূর্তিটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে, ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে ব্রাসো দিয়ে পালিশ করবি। তারপর যেখানে আমি আবির্ভূত হব, ঠিক সেইখানে আমার মন্দির তৈরি করে আমাকে প্রতিষ্ঠা করবি।

মিহির ঃ মন্দির ? এইখানে ? এই রাস্তার মাঝখানে ?

সনাতন ঃ হ্যাঁ দাদা। গোবিন্দ আমাকে বললেন, আড়াই হাজার বছর আগে এই স্থানে আমার মন্দির ছিল। ধরিত্রীর গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে সেই মন্দির, তলিয়ে গিয়েছি আমি। তোর উপর দায়িত্ব দিতে চাই সেই মন্দির আবার গড়ে তোলার। পারবি না তুই ?

মিহির ঃ তুমি কি বললে ?

সনাতন ঃ বললাম, প্রভু আমি কি পারব এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে ? উনি বললেন, পারবি বলেই তো তোকে বলছি।

তনিমা ঃ খবরদার সে চেষ্টা কর না। রাস্তার মাঝখানে মন্দির আজকাল সরকার একদম টলারেট করছে না।

সনাতন ঃ রাধা মাধব তো সরকারের শাসনের অধীন নন। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় এখানে থাকতে — তাহলে এখানেই মন্দির হবে।

তনিমা ঃ ওই সব চালাকি ছাড় সনাতনদা। তুমি ভেবেছ এই ভাবে এখানে একটা মন্দির করে গুছিয়ে বসবে, তাই না ? তুমি নিশ্চয়ই এখানে গর্ত খুঁড়ে ছোলা ঢেলে, তার উপর একটা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি রেখে, মাটি চাপা দিয়ে রেখেছ। শুনেছি, তারপর ওই জায়গায় জল ঢাললেই ছোলা ফুলে উঠে মাটি ফুঁড়ে মূর্তি বেরিয়ে আসে। মিহিরদা, দেখুন তো মাটি ভিজে কিনা ?

মিহির ঃ মাটিত ভেজাই। সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে না।

তনিমা ঃ বাঃ বেশ প্ল্যান করেই কাজ করেছ। ওয়েদার রিপোর্ট দেখে নিয়েছিলে নাকি ? খেটেখুটে জলও ঢালতে হয়নি।

সনাতন ঃ আমাকে সন্দেহ করে কোন লাভ নেই তনিমা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, দেখবে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন রাধা গোবিন্দ মূর্তির আবির্ভাব।

তনিমা ঃ আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন মূর্তি। বললেই হল। মূর্তি যদিও ওঠে, ভাল করে উল্টে দেখবেন লেখা আছে ''মেড ইন চায়না।''

সনাতন ঃ বেশ তো। বিগ্রহ আবির্ভাব হোক, তারপর কার্বন ডেটিং করে জেনে নিও কবেকার মূর্তি।

মিহির ঃ ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু যদি সত্যি ঘটনাটা ঘটে তাহলে কিন্তু এটাকে মিরাক্যাল বলতে হবে।

সনাতন ঃ মিরাক্যাল তো বটেই।

মিহির ঃ তাহলে প্রেসকে একটা খবর দেওয়া উচিৎ ছিল নাকি ? টেলিভিশনে লাইভ ব্রডকাস্ট হত।

তনিমা ঃ প্রেস সনাতনদার কথা বিশ্বাস করে আসতো ভাবছেন ? এই সব বুজরুকি একদম প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়। এমনিতেই দেশের মানুষ ধর্ম ধর্ম করে পিছিয়ে যাচ্ছে। তারপর যদি এসব প্রচার করা হয়, তাহলে আর কথাই নেই। আর আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ মিহিরদা। আপনি কি করে এইসব আজগুবি কথা বিশ্বাস করছেন ?

মিহির ঃ না না, আমি বিশ্বাস করেছি তা তো বলছি না। আমি বলতে চাইছি, এই ধরণের ঘটনাকে তো মিরাক্যালই বলা হয়। আজকের যুগে এরকম মিরাক্যাল অবশ্য ঘটে না।

তনিমা ঃ কোন কালেই ঘটেনি। সনাতনদার মাথায় কি করে যে এই ভূত ঢুকল কে জানে। নিশ্চয়ই কাল রাতে সনাতনদার বদহজম হয়েছিল।

মিহির ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। এসব ব্যাপারকে বেশি আমল দেওয়া ঠিক নয়। শোন সনাতন, এসব পাগলামো বন্ধ কর। বাড়ি চল।

সনাতন ঃ অসম্ভব। রাধাগোবিন্দকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আগে রাধাগোবিন্দ উঠুক —

(সনাতন মাটির দিকে তাকিয়ে।)

মিহির ঃ আর কখন উঠবে ? সাতটা চল্লিশ তো বেজে গেছে।

সনাতন ঃ মাধব বলেছেন সাতটা চল্লিশ গতে। সাতটা চল্লিশ গতে মানে কি মিহিরদা ?

মিহির ঃ মানে — সাতটা চল্লিশের পরে . . . . ?

সনাতন ঃ ঠিক ধরেছেন। একটু অপেক্ষা করুন। রাধা মাধব এতো বছর অপেক্ষা করলেন, আর আপনি এই কয়েকটা মিনিট অপেক্ষা করতে পারছেন না ? ওই দেখ, ওই দেখ মাটি কেমন ফুলে উঠছে।

তনিমা ঃ কোথায় ফুলে উঠেছে ? মাটি যেমন ছিল, তেমনই আছে।

মিহির ঃ এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল। কি করা যায় বলত তনিমা ?

তনিমা ঃ মুশকিলের কি আছে ? বাড়ি চলে জান। কিছুক্ষণ বাদে হতাশ হয়ে সনাতনদাও চলে যাবে।

সনাতন ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ি চলে জান। তবে হতাশ হব না তনিমা। মূর্তি ঠিকই বেরোবে। সেই মূর্তি মাথায় নিয়ে আমি বাড়ি ফিরব।

তনিমা ঃ বেশ। আমি চললাম। মা চিন্তা করছে।

মিহির ঃ চলে যাবে ? কিন্তু সত্যি সত্যি যদি বিগ্রহ আবির্ভূত হয় ? এমন অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ না করাটা বোকামি হবে না ?

তনিমা ঃ মিহিরদা আপনি কি পালটি খেয়ে গেলেন নাকি ?

মিহির ঃ না না তা নয়। (তনিমার কানের কাছে এসে) আমি ঠিক এভাবে সনাতনকে একা ছেড়ে যেতে চাইছি না, বুঝলে না ? তারপর দেখবে কাল একটা মূর্তি হাতে করে এনে ক্লেম করবে এখান থেকে বেরিয়েছে।

তনিমা ঃ হুম এটা একটা পয়েন্ট বটে। বেশ, আর দশ মিনিট অপেক্ষা করে দেখি। তারপর কিন্তু বাড়ি চলে যাব।

মিহির ঃ কই হে সনাতন ? কিছু বুঝতে পারছ নাকি ? মাটি ফুলে উঠেছে বলছিলে —

(মিহির সনাতনের পাশে উবু হয়ে বসে মাটিতে হাত বুলিয়ে দেখেন। কেশব আর পরমেশ পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ওদের দেখে থমকে দাঁড়ায়। পরমেশের কাঁধে একটা ব্যাগ।)

পরমেশ ঃ আরে, এই তো সনাতন। তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম।

কেশব ঃ কি ব্যাপার মিহিরদা ? কিছু খুঁজছেন নাকি ?

মিহির ঃ ওই মানে —

পরমেশ ঃ একটা টর্চ জ্বালিয়ে নেবেন তো। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় নাকি ?

(পরমেশ পকেট থেকে একটা টর্চ বার করে জ্বালায়।)

পরমেশ ঃ কই দেখি ? কি হারিয়েছে ?

তনিমা ঃ হারিয়ে ছিল। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে।

কেশব ঃ ওরেব্বাস ! সে তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ?

মিহির ঃ তনিমা ঠাট্টা করছে। আসলে আমার পকেট থেকে —

তনিমা ঃ ঠাট্টা করছি ? সনাতনদা, তুমি বল না। আমি কি ভুল কিছু বলেছি ?

সনাতন ঃ আঃ, তোমরা একটু চুপ করবে ? আমি একটা কিছু শুনতে পাচ্ছি।

(সনাতন মাটির কাছে কান নিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করে। দেখা দেখি মিহির ও কান পাতে।)

কেশব ঃ (ফিস ফিস করে তনিমাকে) কি শোনার চেষ্টা করছে ওরা ?

পরমেশ ঃ মোবাইল ফোন হারিয়েছে নাকি ? ভাইব্রেশনে ছিল ?

সনাতন ঃ মিহিরদা, শুনতে পাচ্ছেন ?

মিহির ঃ মনে হচ্ছে — কিছু একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে।

তনিমা ঃ যতো সব ঢপবাজি। (কেশব আর পরমেশকে) আপনারা কিছু শুনতে পাচ্ছেন ?

কেশব ঃ একটা শব্দ তো শুনতে পাচ্ছি। মালগাড়ির শব্দ।

পরমেশ ঃ সে তো আমিও শুনতে পাচ্ছি।

তনিমা ঃ মালগাড়ির লাইন তো এখান থেকে দুই কিলোমিটার দূরে। আপনারা এখানে মাটির ভেতর থেকে কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কি ?

পরমেশ ঃ মালগাড়ির চাকার শব্দ অবশ্য মাটিতে কান পাতলে আরও ভাল শোনা যায়। ছোটবেলায় আমরা শুনতাম —

মিহির ঃ কই হে সনাতন, শব্দ তো থেমে গেল।

কেশব ঃ সে তো থামবেই। মালগাড়ি তো পাস করে গেল।

মিহির ঃ না হে। আজ আর কিছু হবে বলে মনে হয় না। কাল আবার এসো না হয়।

কেশব ঃ সেই ভাল। দিনের আলোতে খুঁজতে সুবিধে হবে।

(সনাতন তাও মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে)

তনিমা ঃ বেকার এতোটা সময় নষ্ট। বাড়ি যাও সনাতনদা। রাতে একটা হজমের বড়ি খেয়ে ঘুমিও। আমি চললাম মিহিরদা। আর থাকতে পারছি না।

মিহির ঃ হ্যাঁ সনাতন অনেকক্ষণ তো দেখলে। এখন মনে হয় বাড়ি যাওয়াই ভাল।

পরমেশ ঃ সনাতন বাড়ি যাবার আগে তোমার জিনিসটা নিয়ে যাও। (ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া একটা জিনিস বার করে) বিশ্বনাথ নিয়ে এসেছিল দোকানে। বলল তোমার জন্য এনেছে। তুমি নাকি অর্ডার দিয়েছিলে ? যখন বললাম আমি তোমার বাড়ির কাছেই থাকি, ও বলল তোমাকে দিয়ে দিতে। তা এখানেই যখন দেখা হয়ে গেল; এই নাও। বেশ বানিয়েছে কিন্তু মূর্তিটা।

মিহির ঃ মূর্তি ? কিসের মূর্তি ?

পরমেশ ঃ রাধা গোবিন্দের মূর্তি। এই তো দেখুন না। (কাগজের মোড়ক খুলে একটা পিতলের রাধা গোবিন্দের মূর্তি বার করে) বিশ্বনাথ বলল তুমি নাকি প্রায় মাস ছয়েক আগে ওকে বৃন্দাবন থেকে আনতে বলেছিলে ? নাও ধর।

(সনাতনের হাতে মূর্তিটা তুলে দেয় পরমেশ। সকলের হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। আলো নিভে যায়।)

সমাপ্ত

Sudipta Bhowmik – He lives in USA. He has written many plays. His plays have been staged in the US and Kokata.

স্মৃতিচারণ

‘মেরাজকে’-র স্মৃতি

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

একই রকম ভাবে আমাদের দিন কাটছে। দিনের বেলা আমরা গাছের তলায় বসে গল্প করছি, একা একা থাকলে বাড়ির কথা মনে হয়। সকলের সাথে কথা বললে মনটা অন্যরকম থাকে। হঠাৎ এয়ার রেড হলো। আমরা তো নিয়ম অনুযায়ী ট্রেঞ্চ-এর মধ্যে চলে গেলাম। গর্তের ভেতর অনেকটা নিরাপদ। সেলিং-এর নিয়ম, আকাশে ফাইটার থেকে সেল ছাড়লে, যেখানে পড়বে ঐখানে গর্ত হয়ে যায়। আর সেলের স্প্রিন্টার খানিকটা উপরের দিকে উঠে যায়। যেমন কোনো পুকুরে যদি একটা ইঁট ছোঁড়া হয়, যেখানে ইঁটটা পড়বে তার আশেপাশের জলে খানকিটা উপরের দিকে ছিটকে আসে ঠিক সেরকম। আমরা ট্রেঞ্চের ভেতর বসে আছি আর মেজর এইচ. এম ডোডি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের ফাইটার প্লেনটার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমরা সকলে ওনাকে অনুরোধ করলাম ভেতরে চলে আসতে। উনি বললেন ভয় নেই প্লেনটা যেখানে আছে সেখান থেকে আমাদের মারতে পারবে না। এয়ার রেড-এর সময় প্লেনের উচ্চতা অনেকটা কমিয়ে আনে। আকাশে সোজা যখন ভাসতে থাকে তখন কিন্তু সেলটা ছাড়েনা, সেল ছাড়ার সময় ভাসতে ভাসতে হঠাৎ ড্রাইভ মারে আর ঠিক ওই সময় সেল ছাড়ে। ডোডি সাহেব ওনার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন যে ফাইটারটার জ্যামিতিক অবস্থান অনুসারে, ও এই মুহূর্তে ড্রাইভ মেরে সেল ছাড়লে সেই সেল আমাদের কাছ অবধি পৌঁছবে না। আমরা যদিও ভয়ে ট্রেঞ্চের মধ্যেই রইলাম। কিছুক্ষণ পর অফিসার-এর নির্দেশ মতো অল ক্লিয়ার-এর হুইসিল শুনে বুঝলাম তখনকার মতন ফাঁড়া কাটলো। ট্রেঞ্চের বাইরে এলাম। ট্যাঙ্ক যেমন যেমন আগে আগে যায়, তেমন তেমন ভাবে নির্দেশমতো আমরাও এগোই। আর শত্রুপক্ষের চাপ থাকলে ট্যাঙ্ক পিছিয়ে আসে আর সাথে সাথে আমরাও মানে পুরো সাপোর্টিং স্টাফও পিছিয়ে যাই। এইভাবে আগে পিছে করতে করতে এই শিয়ালকোট সেক্টরে আমরা বর্তমানে পাকিস্তানের প্রায় আটত্রিশ কিলোমিটার ভেতরে চলে এসেছি ভারতের শেষ গ্রাম থেকে। শুনছি রাজস্থান সেক্টরে ওরাও ভারতের বেশ কিছুটা অংশ কভার করে নিয়েছে। কতদিন এই দখলদারি পাল্টা দখলদারি চলবে কে জানে।

দুপুরে এবং রাত্রে ঠিকমত খাবার পাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু স্নান করার সুযোগ হচ্ছে না। কখনো জলের অভাব তো কখনো সময়ের। বিকালেই রাতের খাবার খেয়ে তৈরী হয়ে নিলাম প্রতিদিনের মতো। অন্ধকার হলেই আমরা ট্যাঙ্ক হারবারের দিকে এগিয়ে যাবো। আজ যাবার সময় একটু সমস্যা হলো। দিনের বেলা রেইকি Troop রাস্তা রেইকি করে রাখে, যাতে রাত্রে সাপোর্টিং স্টাফ সহজে রাতের অন্ধকারে ট্যাঙ্ক হারবারে পৌঁছতে পারে। যে কোনো কারণে আজ রাস্তার গোলযোগ হয়ে গিয়েছিল। বার বার ওয়ারলেস-এ কথা বলে, ম্যাপ খুলে আমরা এগোতে লাগলাম। নির্দিষ্ট কোনো রাস্তা তো থাকে না। প্রতিদিনই রাস্তা পাল্টে যায় পরিস্থিতি অনুসারে। আমাদের সবার অনিশ্চিত জীবনের প্রতিরূপ। এই সব কারণে আজ হারবারে পৌঁছতে বেশ দেরি হলো। ওখানে পৌঁছে আমার যা কাজ, প্রত্যেক ট্যাঙ্কে গিয়ে ওই ট্যাঙ্কের ওয়ারলেস সেটের রিপোর্ট নেওয়া, সেটে কোনো সমস্যা থাকলে সেটার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। মানে রাতের আঁধার থাকতে থাকতে পরের দিনের যুদ্ধের জন্য ট্যাঙ্কগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থার নিশ্ছিন্দ্র নিরাপত্তা এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা। মেডিকেল টিম, মেস, ফুয়েল, এমুনিসিন সাপ্লাই সবাই এমনি ভাবেই যে যার কাজ করে রাতের আঁধার থাকতে থাকতেই আবার পিছিয়ে আসে। আজ কাজ কম ছিল। সবকটা ট্যাঙ্ক চেক করেও হাতে অনেকটা সময়। FRT টিমের একজনকে বলে একটা ট্যাঙ্কের নিচে একটু বিশ্রাম নেবো বলে ঢুকলাম। ঘুম তো হবে না। শুধু একটু শুয়ে থাকতে হয়। ওখানে তো বিছানার কোনো ব্যাপার নেই। ট্যাঙ্কের নিচটা অনেকটা নিরাপদ। ট্যাঙ্কের নিচটায় দেখলাম একটা কম্বল ভাঁজ করে রাখা আছে। সম্ভবতঃ আমার আগে কেউ ওই ট্যাঙ্কের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। আমি ওই কম্বলটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হারবারের কাজ চলছে। কোনো

আলো নেই। আলো জ্বালিয়ে শত্রুপক্ষের নিশানার সুবিধা করে দেওয়া মানে নিজেদের কবর নিজেরাই খোঁড়া। রাতের আঁধারে যে যার কাজ করে চলেছে। আমরা যেন সকলে যন্ত্র হয়ে গেছি। যুদ্ধে খাবার কোনো অসুবিধা না থাকলেও ঘুমের বড়ো অসুবিধা। রাতের বেলা আমাদের মানে, সিগন্যালিং স্টাফ এবং বাকি সাপোর্টিং স্টাফদের কাজ করতে হয়, আর দিনের বেলা বোম্বিংয়ের ভয়। FRT (ফিল্ড রিপেয়ার টিম)-এর গাড়িগুলো দিনের বেলা কোনো গাছের নিচে ক্যামোফ্লেজিং নেট দিয়ে ঢেকে, তার ওপরে গাছের ডালপালা চাপা দিয়ে নিজেরা ট্রেঞ্চের আশেপাশে প্রাণ হাতে করে বসে থাকা। পড়ে থাকা কম্বলটা মাথায় দিয়ে শুয়ে আছি, সকাল হবার আগেই নির্দেশ এলো আমাদের পিছনে আমাদের জায়গায় ফিরে যেতে হবে। ট্যাঙ্কের নিচ থেকে বের হবার সময় অনেক খোঁজা খুঁজি করেও পড়ে থাকা কম্বলটার কোনো মালিক খুঁজে পেলাম না। কম্বলটা বগলে করে আমাদের নির্দিষ্ট জীপে গিয়ে বসলাম মনে হচ্ছে কুড়িয়ে পাওয়া কম্বলটা আমার কাজে লাগবে। কারণ আমার কোনো বিছানা নেই। আমার সমস্ত জিনিসপত্র তো জম্বুতে ARV রোড সাইড হয়ে যাওয়ার সময় ARV তেই রয়ে গেছে। সে তো আর এক গল্প। এখন সেই ARV কোথায় আছে কে জানে ? আমার একার নয়, সেই সময় আমার সাথে যারা ছিল প্রত্যেকেরই একই অবস্থা। অগাষ্ট মাসের শেষ রাতে শিয়ালকোট সেক্টরে বেশ শিরশিরে ঠান্ডা থাকে। গাড়ি চলার সময় কম্বলটা গায়ে দিয়ে বসতাম। একটা কুড়িয়ে পাওয়া কম্বল বেশ ভালোই কাজ দিচ্ছিলো। ওই কম্বলটা আমাদেরই কারো না কারো হবে। কিন্তু কার, সেটা অনেক খুঁজেও বের করতে পারিনি। মজার ব্যাপার, সেই নীলরঙের কম্বলটা এখনো আমার বাড়িতে যুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে যত্ন করে রাখা আছে।

দিনের বেলা আমাদের জায়গায় এসে গাড়ি ক্যামোফ্লেজ করে আশেপাশে লোকজনের ছেড়ে যাওয়া ঘরবাড়িতে ঘুরে বেড়াতাম। দুইপক্ষের হানাহানিতে কতোদিনকার বসতবাড়ি ছেড়ে নিরীহ লোকজনকে পালাতে হয়েছে। ভারতের সীমান্তের গ্রামগুলোরও একই দশা। কত ঘর-গৃহস্থালির জিনিসপত্র রয়ে গেছে পিছনে। এর মধ্যে হয়তো কত স্মৃতি, কত আবেগ আছে আমরা জানি না। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো। ফেলে যাওয়া মাটির কলসি হাঁড়ির মতো কেউ ফেলে গেছে তার বৃদ্ধা মা কে। পালানোর সময় বার্ধক্য যে চলার অন্তরায়। হায় রে ! কোনোমতে লুকিয়ে জীবনযাপন করছিলেন। আজ আমাদের চোখে পড়ে গেছেন। বৃদ্ধা প্রথমেই আমাদের বিশ্বাস করেননি স্বভাবতই। আমরা তো তাঁর কাছে শত্রুপক্ষের সৈনিক। ভারত এবং পাকিস্তানের মন্ত্রীমহলে কি শত্রুতা চলছে জানিনা। আমরা সাধারণ সৈনিক পেটের ভাত জোগাড়ের জন্য এই গুলিগোলার মধ্যে এসে পড়েছি বলে আমাদের মায়ের সমান এই পাকিস্তানি বৃদ্ধাকে আমরা কেউই শত্রু বলে মনে করিনি। আস্তে আস্তে বৃদ্ধার ভয় কাটলো। তারপর থেকে যতদিন আমরা ওই চত্বরে ছিলাম আত্মীয় পরিজনহীন ওই পরিত্যক্ত পাকিস্থানি বৃদ্ধার খাবার যেত আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর হেঁসেল থেকে। তার কথা এই পঞ্চাশ বছর পরেও মনে আছে।

গতকাল রাতে নাইট হারবারে একটু কানাঘুসো শুনেছিলাম যে যুদ্ধ বোধহয় আপাতত বন্ধ থাকবে। পাকিস্তান অনেকটা পিছিয়ে গেছে। আর যুদ্ধ চালাতে চাইছে না। এটা একটা যুদ্ধের চাল হতে পারে। আমরা যখন বিনা বাধায় অনেকটা এগিয়ে যাবো, সেই সময় আগে থেকে এবং পিছন থেকে আমাদের আক্রমণ করবে। দেখা যাক কি হয়। একদিন পরে পরিস্কার অফিসিয়াল সিজ ফায়ার এর অর্ডার হলো। এটা একটা আন্তর্জাতিক হুকুমনামা। এরপর কোনো অবস্থাতেই আর কোনো পক্ষ গুলি চালাতে পারবে না। দেখতে দেখতে প্রায় বাইশ তেইশ দিন কেটে গেছে। আমাদের পুরো ফাইটিং এছিলোঁ খানিকটা পিছিয়ে এলো। আমরা সাপোর্টিং স্টাফরা একটু এগিয়ে গিয়ে একজায়গায় ঘাঁটি গাড়লাম। নো ম্যানস ল্যান্ড-এর একটু পিছনে আমরা আছি। বাইনাকুলার দিয়ে পাকিস্থান আর্মির সব মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে। ওরাও নিশ্চয়ই আমাদের একই ভাবে দেখছে। সব ট্যাঙ্ক আর 'B' ভেহিকল মানে একটন বা তিনটন বড়ো ট্রাক সব গাছের তলায় ক্যামোফ্লাজ করে রাখ হলো। আর আমাদের FRT টিমের জীপ একটা ভাঙা ঘরের সামনে রেখে মাটিতে বড়ো বড়ো দুটো ট্রেঞ্চ কেটে ভাঙা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। মাটিতে গ্রাউন্ড শিট পেতে তার ওপরে শতরঞ্জি আর কম্বল পেতে

বিছানা । এখানে এর থেকে ভালই ব্যবস্থা আর হয় না । বাড়িতে চিঠি লেখা শুরু হলো । যদিও যা কিছু হচ্ছে প্রচন্ড সাবধানতা আর কড়া পাহারার মধ্যে । যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কোনো জায়গায় বড় বড় দোকান লুট হতে দেখেছি । সিভিলিয়ানরা গরু বা মহিষের গাড়ি করে লুট করে নিয়ে গেছে নিজেদের জায়গায় । তবে সেনাবাহিনীর কোনো লোককে কখনো লুট করতে দেখিনি । যতটুকু প্রয়োজন নিশ্চয়ই কেউ কেউ নিয়েছে পরিত্যক্ত দোকান বা ঘর বাড়ি থেকে কিন্তু অপ্রয়োজনে কখনো নয় । সে ইচ্ছেই কখনো কারো হতো না । কারণ আর একঘন্টা পর যার বেঁচে থাকাটারই কোনো স্থিরতা নেই, তার মনে অন্যের জিনিস নেওয়ার চিন্তা আসে না । সমস্ত চিন্তা তখন প্রাণটুকু রক্ষা করার । আর কিছু নয় ।

আর কোনো গ্রাম বা শহরের নাম ভুলে গেলেও পাকিস্তানের 'মেরাজকে' গ্রামকে কখনো ভুলবো না । ১৯৬৫র যুদ্ধের সিজ ফায়ারের পর শিয়ালকোট সেক্টরে পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে আটত্রিশ কিলোমিটার ভেতরে এই গ্রামে আমরা ছয় মাস ছিলাম । ঘাঁটি আগলে । যেমন পাকিস্তান সেনা ছিল আমাদের রাজস্থানে । যুদ্ধের আগে পিছের অজস্র স্মৃতির মধ্যে 'মেরাজকে'র ওই ছয় মাসের স্মৃতি, ওই স্বজন পরিত্যক্ত বৃদ্ধা চিরকালীন স্মৃতির একটা অংশ হয়ে রয়ে গেলো । যা আজ পঞ্চাশ বছর পরেও অম্লান ।

''আমার বাবার লেখা ১৯৬৫'র ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কিছু ডায়েরির অংশ । ওই সময়কালীন বা তার আগে-পরের দিনলিপি ও কিছুটা স্মৃতি থেকে একটা অংশ পাঠালাম ।'' — অর্পিতা চ্যাটার্জী, Nebraska, USA

Prasanta Chatterjee. 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

স্মৃতিচারণ

Sir Don Bradman

সিদ্ধার্থ দে

খুব ছোটবেলার কথা — ষাটের দশকের প্রথমার্ধ। বয়স আমার সাত বা আট। একটু একটু পড়তে শিখেছি, কিন্তু দুপুরবেলার আধো অন্ধকার ঘরে মায়ের পড়ে দেওয়া গল্পই বেশী উপভোগ করতাম।

মায়ের পড়ে শোনানো একটা বই-এর কথা মনে আছে — 'ব্র্যাডম্যান ও ক্রিকেট'। লেখকের নাম আজ আর সঠিক স্মরণ করতে পারছি না — কেমন যেন মনে হচ্ছে শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও হতে পারেন। যাই হোক, ক্রিকেটের খুঁটিনাটি সে বয়সে ভালভাবে না বুঝলেও একটা আন্দাজ করেছিলাম ভদ্রলোক গড়পড়তা ক্রিকেট খেলোয়ার নন — এক মহীরূহ বিশেষ।

সেই সময়ে বিদেশ তো কোন ছাড় — বাংলার বাইরেও খুব একটা কোথাও যাইনি। অষ্ট্রেলিয়া সম্পর্কে মা যেটুকু বলেছিলেন সেটুকুই জানতাম। একটা বিশাল দ্বীপ, লোক খুবই কম। বেশীর ভাগ মানুষই বিলেত থেকে গিয়ে সে দেশে বসতি স্থাপন করে — এঁদের অনেকেরই খুব পছন্দের খেলা ক্রিকেট। ব্র্যাডম্যান সাহেব এঁদেরই একজন।

মায়ের বলা গল্প শুনে কল্পনা করতাম — বাওরাল নামের অষ্ট্রেলিয়ার এক গ্রামে একটি আমারই বয়সী ছোট্ট ছেলে পিংপং বলের সাইজের একটি বল দেওয়ালে ছুঁড়ে মারছে — ফিরে আসা বলটাকে একটা স্টাম্পকে ব্যাট বানিয়ে পেটাচ্ছে। আমিও চেষ্টা করেছিলাম — পেটানো তো দূরের কথা, স্টাম্পে-বলেই করতে পারিনি।

সেই ছেলেটিই বড় হয়ে অনেক অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছে। তাই বইটির নাম 'ব্র্যাডম্যান ও ক্রিকেট'। ওঁর নামের সঙ্গে ক্রিকেট অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাঁকে বাদ নিয়ে এই খেলা নিয়ে কোন আলোচনা চলে না।

৩৫ বছর বয়সে দৈবের বশে ব্র্যাডম্যানের দেশেই নিজের জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলাম ১৯৯০ সালে। এসে কিছুটা আশাহত হলাম — ক্রিকেটের চেয়ে একটা মারদাঙ্গা খেলাই যেন বেশী জনপ্রিয়। সে খেলায় কথায় কথায় ষন্ডামার্কা পুরুষের দল একে অপরের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে — খেলাটার নাম ফুটবল কিন্তু বল নামক বস্তুটির একটা বিদঘুটে চেহারা। যেমন কিম্ভূত কিমাকার জন্তু জানোয়ার দেশটাতে তেমনি খেলার ছিরি।

তবে ১৯৯১ সালের শেষদিকে ভারত এলো সফর করতে। তখনো ভারত বিদেশে জিততে শেখেনি, তবে দলটিতে সচীন তেন্ডুলকর নামে এক ১৯ বছরের উঠতি মহাতারকা ছিল। আর ছিল ১৮ বছরের এক বাঙালি যুবক। সে নাকি খুব উদ্ধত স্বভাবের, তাকে খেলায় নেওয়া হত না — সেজেগুজে দাদাদের জল বয়ে নিয়ে যাওয়া ছিলই তার কাজ। পরবর্তীকালে সৌরভ গাঙ্গুলি নামে এই ছোকরা সাহেবদের দেশে গিয়ে ওদের হারাতে শিখিয়েছিল ভারতীয়দের।

১৯৯২-র একেবারে শুরুতে সেই মুহূর্ত এলো। হাজির হলাম সিডনি ক্রিকেট মাঠে। তাও আবার ভারত অষ্ট্রেলিয়ার খেলা। বিশ্বাসই হচ্ছিল না যেন। তখন এদেশে আজকের মত লাখ ছয়েক স্থায়ী ভারতীয় বংশোদ্ভুত বাসিন্দা ছিল না। তাই মাঠে ঢোকার সময়ে আমাকে এক আমোদপ্রিয় Aussie জিজ্ঞেস করল ''তুমিই কি সেই গত রাতে উড়ে আসা mystery স্পিনার ?''

সেই টেস্টে প্রায় হারতে হারতে অস্ট্রেলিয়া কেঁদে ককিয়ে ড্র করল। খুব গর্ব হচ্ছিল — কিন্তু নতুন দেশে আনন্দের অভিব্যক্তি বিশেষ বাইরে প্রকাশ করতে সাহস হয়নি। বাচ্চা সচীনের ম্যাকডারমট এবং প্রথম টেস্ট খেলা শেন ওয়ার্ণ নামে এক বোলারকে হেলায় পেটানো আজও চোখে ভাসে। রবি শাস্ত্রী ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। আর সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে

এক বঙ্গসন্তান বেশ ভাল বল করেছিলেন। কোন অজ্ঞাত কারণে বেশ কয়েকটি উইকেট পাওয়া সত্ত্বেও সুব্রত আর কোনদিন টেস্টে সুযোগ পাননি। শুনেছি পরবর্তীকালে সিডনির বাসিন্দা হয়ে গেছেন সুব্রত।

এদেশে থাকতে থাকতে জানলাম ক্রিকেট ভাল খেললেও বড়জোর দশ থেকে পনেরো শতাংশ অস্ট্রেলিয় মানুষ খেলাটির সেরকম ভাবে খোঁজ খবর রাখেন। এছাড়া আমাদের মত ব্যক্তিপূজা এদেশের জাতীয় চরিত্র বিরোধী। আমার অত্যুৎসাহে জল ঢেলে এক সমবয়সী সহকর্মী একবার মন্তব্য করেছিলেন ''তোমরা ক্রিকেট খেলোয়ারদের নিয়ে এত মাতামাতি কর — কুইন্সল্যান্ডে আমার পাশের বাড়িতে গ্রেগ চ্যাপেল থাকতেন এক সময়ে, আলাপ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বারকয়েক গুড ডে (এরা যদিও উচ্চারণ করে 'গিডে !') বলা ছাড়া বিশেষ কথাবার্তা হয়নি।'' আসলে এদেশে প্রায় ঘরে ঘরে খেলোয়াড়, মাত্র আড়াই কোটি মানুষের রাষ্ট্রটিতে অলিম্পিক পদক জয়ীর ছড়াছড়ি। তাই কোন বিশেষ খেলোয়াড়কে নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি বা আদিখ্যেতা নেই।

কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু আছে। অন্যতম ব্যতিক্রম সেই ডন ব্র্যাডম্যান। প্রখ্যাত লোক সঙ্গীত গায়ক জন উইলিয়ামসনের একটি গান শুনলাম সেদিন। নাম 'স্যার ডন !'। লম্বা গানের প্রথম কটি লাইনের কথাগুলি একবার শুনেই মুখস্থ হয়ে গেল —

''When aunty Ducke danced with Donald Bradman

She said it was the highlight of her life,

That wizard of the willow swept her off her feet,

Along with all Australians, every man on the street,

Sir Don you gave us pride in ourselves,

Please come back for one last parade !''

গানটির ইউটিউব লিঙ্ক দিলাম নীচে :

'স্যার ডন' : John Williamson

বড় হয়ে ক্রিকেটে উৎসাহ যখন পাগলামি ছুঁয়েছে, বুঝেছি ৫২টি টেস্টে ৯৯.৯৪ ব্যাটিং গড় সহজ নয় — অতিমানব ছাড়া এই অ্যাভারেজ করা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তিপূজায় অনুৎসাহী Aussie-রাও এঁকে রেয়াত করে কিছুটা। উইলিয়ামসনের আর্তি — ''Please come back for one last parade!'' আর একটিবার, শেষবারের জন্য, অন্তরালপ্রিয় মানুষটিকে জনসমক্ষে আসার জন্য আবেদন। সেইজন্যই বাওরাল শহরে রয়েছে ব্র্যাডম্যান মিউসিয়াম।

সাহেবদের সঙ্গে খেজুর আলাপ শুরু করার জন্য আবহাওয়া নিয়ে কোন মন্তব্য করাটা মোটামুটি নিরাপদ পন্থা। বাসে পাশের যাত্রীর উদ্দেশে ''It's a nice day, isn't it ?'' মন্তব্যটি করা যেতেই পারে। ভারতীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্বেতাঙ্গ মানুষও বুঝে গেছে আমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপের বরফ ভাঙার জন্য ক্রিকেটিয় আলোচনার কার্যকারিতা।

১৯৯৫ সালে এক অফিসের পার্টিতে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড শহর থেকে আসা ক্যফ ক্যালেস্কি নামে এক ভদ্রলোক ঠিক তাই করলেন। বহুদিন দেখা হয়নি, তবু জিয়ফের চেহারাটা এখনও মনে আছে। লম্বা, ছিপছিপে মেদহীন পেটানো শরীর। সেই সময়ের বছর ৪৫-এর মানুষটির মুখশ্রীও সুন্দর, বেশ হলিউড নায়কদের মত যেন। সম্প্রতি বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। নিজে থেকেই প্রাক্তন স্ত্রীর গল্প করছিলেন। আন্দাজ করলাম ভালবাসা তখনো সজীব — কিন্তু কোন কারণে ছাড়াছাড়ি। মুখের আপাত প্রফুল্লতার আড়ালে চাপা বেদনার ছাপ। পশ্চিমী মানুষদের মানসিকতা আমরা বুঝিনা। ওরাও বোঝেনা আমাদের।

যাইহোক ক্রিকেট প্রসঙ্গে কথার মাঝে বললাম — ''স্যার ডন তো আপনাদের শহরে থাকেন !'' তারপর ওঁর বিষয়ে নানা কথা হল। মাঝে জিয়ফ বললেন ''Would you like to get the old man's autograph ?'' আমি তো হতবাক। বললাম ''আপনি ওঁকে চেনেন ?'' হেসে উত্তর দিলেন ''একেবারেই চিনিনা, তবে আপনার যা উৎসাহ দেখছি একটু চেষ্টা করতে পারি জোগাড় করার। তবে কথা দিচ্ছিনা।''

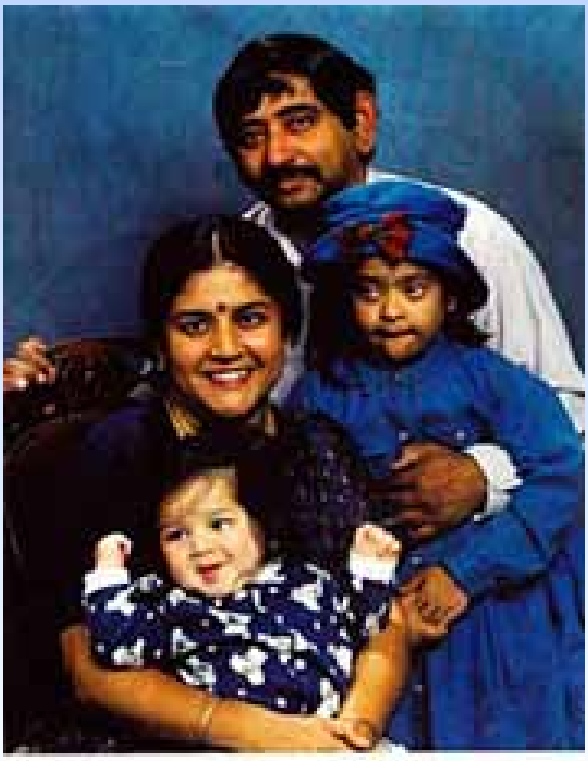

জিয়ফের প্রস্তাব অনুযায়ী দিন কয়েক বাদে আমাদের একটি পারিবারিক ছবির তলায় সই-এর জন্য কিছুটা জায়গা রেখে অফিসের ওভারনাইট ব্যাগে অ্যাডিলেড পাঠিয়ে দিলাম। (তখনও কনিষ্ঠ কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম হয়নি — তাই ও ছবিতে ছিলনা)। সঙ্গে একটি ছোট চিঠি — ''আমি যে দেশ থেকে আসছি সে দেশে আপনার ভক্তের সংখ্যা অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার বেশ কয়েকগুণ। আপনার অটোগ্রাফটি আমাদের পরিবারের একটি অমূল্য সম্পদ হবে।''

আসলে জিয়ফ আমার কাছে বিস্তারিতভাবে ব্যাপারটা ভাঙেননি। উনি জানতেন ব্র্যাডম্যান দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে সপ্তাহে একদিন করে আসেন চিঠিপাত্রের জবাব দেবার জন্য।

সেই ভরসাতেই সেখানে চিঠিসহ ছবিটি রেখে এসেছিলেন কোন এরদিন।

প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। হঠাৎ একদিন কাজের মাঝে আমার নাম ''Private and Confidential'' লেখা একটা খাম পেলাম। খুলে দেখি . . . আর কিছু লিখলাম না। ছবিটির সব কথা বলবে।

ছবিটি সযত্নে রাখা আছে অন্যান মূল্যবান কাগজপত্রের সঙ্গে। এক বেরসিক বন্ধু মন্তব্য করেছিল ছবিটি নিলামে তুলতে। কিন্তু এ ছবি যে স্যার ডনের আঙুল ছুঁয়েছে — এ তো হাটে বিকোবার নয়। যাবার সময়ে এমন একজনকে দিয়ে যাব যাকে বিনামূল্যে দিতে পারি।

জিয়ফের সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হয়নি। উনি বারকয়েক ক্যানবেরা এসেছিলেন তারপরে। কিন্তু নানা কারণে দেখা হয়নি। সেই পার্টিতে উনি একটা বিয়ার shout করেছিলেন। সেই ঋণটা অবধি শোধ করে উঠতে পারিনি। অন্য ঋণটার কথা বাদ-ই দিলাম।

সিদ্ধার্থ দে — আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের স্নাতক। স্নাতোকত্তর পড়াশুনা আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যানপ্শায়ারে। ১৯৯০ সাল থেকে পাকাপারি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে। দীর্ঘদিন ক্যানবেরা নিবাসী। ২০১৫-তে কর্মজীবন শেষ করে আপাতত সাহিত্য চর্চা, ভ্রমণ, টুকটাক লেখালেখি নিয়ে আছি। আর হ্যাঁ — ফেসবুকে, ওয়াটস্অ্যাপ ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও জীবনের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালে।

আমার মূলত ব্লগধর্মী কিছু লেখা desidd.wordpress.com সাইটটিতে সংকলিত করেছি।

রন্ধনপ্রণালী

পটল পুরাণ

জয় মুখোপাধ্যায়

''এতদিন কোথায় ছিলেন ? পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে শুধালেন নাটোরের বনলতা সেন।''

না, তা নয়, তবে কাছাকাছি। ''এতদিন কোথায় ছিলে ? মামা, আজ তোমাদের জন্যে এক বিশেষ রান্না করেছি।'' পটল-চেরা চোখ তুলে বলল হাওড়ার পুরবী। যখনই কোলকাতায় যাই, সপরিবারে বা একা, তখনই হাওড়ায় আমার ভাগ্নের বাড়ী যাওয়া হয়, আর প্রতিবারই পুরবী, মানে আমার ভাগ্নে-বউ নানারকম সুখাদ্য রন্ধন করে পরিবেশন করে।

সেই বিশেষ রান্নাটি কিন্তু মাছের পাতুরি বা ডিমের ডেভিল জাতীয় আমিষ বস্তু নয়, নিতান্তই নিরামিষ ''পোস্ত-পটল''। কিন্তু এত ভালো লাগল খেয়ে যে এখনো যেন জিভে সে স্বাদ লেগে আছে। সেই রান্নাটা এখন তোমাদের শিখিয়ে দিই। এখন সব জোগাড়-যন্ত্র করে ফেল, বলছি কি কি লাগবে।

পটল (মাঝারি আকারের) ৫০০ গ্রাম, পোস্ত ১০০ গ্রাম (ভালো করে বেটে নাও)।

মশলা-পাতি বলতে — আন্দাজ মতো কালো জিরে, হলুদ আর লংকা পাউডার, নুন, চিনি আর কাঁচা লংকা। রান্নাটা সরষের তেলে করলে ভাল লাগবে।

প্রথমে পটলের খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে রাখো। কড়ায় সরষের তেল নাও। গরম হলে কালো জিরে ফোড়ন দাও। এবার পটলটা দাও। নুন, হলুদ, লংকা দিয়ে খানিক নাড়া-চাড়া কর। দেখো পটলটা একটু নরম হয়েছে তো ? এবার পোস্তো বাটা দাও আর নাড়া-চাড়া করতে থাক। একটু জল আর এক চামচ চিনি দাও, ঢাকা দিয়ে রাখো, রান্নাটা হতে থাক।

যখনই পটল খাই একটা মজার গল্প মনে পড়ে যায়। আচ্ছা, রান্না হতে থাক্, গল্পটা বলি।

জানো তো আমাদের ছোটবেলায়, কোলকাতায় গরমকালে তরকারি বলতে পাওয়া যেত পটল, কুমড়ো আর লাউ। গরমকালে প্রায় রোজই পটল ভাজা, আলু-পটলের তরকারি খেয়ে, আমার কাছে কখনো মনে হয়নি যে পটল কে সুখাদ্যের তালিকায় আনা যেতে পারে।

প্রায় ৪০ বছর পরে, আমি ব্যাঙ্গালোরে (ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়ান্স) গবেষণা-ছাত্র হয়ে আসার পরে দেখলাম এখানকার বঙ্গ-জনতা পটলের জন্য পাগল। কারণটা সহজ, তখন ব্যাঙ্গালোরে পটল ছিল দুষ্প্রাপ্য। তাই যখনই কোন বন্ধু বা পরিচিত কেউ কোলকতা যেত, পটল না-খেতে পাওয়া বুভুক্ষু বঙ্গ-জনতা অনুরোধ জানাত, ''অসুবিধে না হলে পটল নিয়ে এস।'' হয়ত বা কোন প্রেমিক কে আব্দার করে বলত ''এবার কোলকাতা থেকে আসার সময় আমার জন্যে পটল আনা চাই-চাই।''

আমার গবেষণা গুরু ছিলেন প্রফেসর উমা শংকর নন্দী, রসিক মেজাজের ছিলেন, আমাদের খুব মজার মজার গল্প বলতেন। তিনি গত হয়েছেন বহু বছর হল।

যাক, যে গল্পটা বলছিলাম। প্রফেসর নন্দীর অন্যান্য পুরোন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিল দুজন বাঙালী ছাত্র সুবীর আর অমিত এবং এক অবাঙালী ছাত্রী সুভদ্রা।

আমার একবার কিরকম মনে হয়েছিল যে অমিত ও সুভদ্রা যেন পরস্পর পরস্পরের দিকে অন্য ভাবে তাকায়, কিন্তু সে কথা তো আর কাউকে বলা যায় না ! সুভদ্রা তাড়াতাড়ি গবেষণা শেষ করে কোন এক বিখ্যাত মহিলা কলেজে চাকরী নিয়ে চলে গেল, অমিত তখনও ছাত্র, গবেষণা প্রায় শেষ ধাপে।

সেবার পুজোর আগে অমিত বলল, ''এবার পুজোয় বাড়ী যাচ্ছি স্যার, দুসপ্তাহের ছুটি চাই।'' প্রফেসর বললেন,

''আচ্ছা, কোলকাতার পুজোয় আনন্দ কোরো'', আর — একটু থামলেন, আমি তখনই বুঝে গেছি এবার কি আসছে। হেসে বললেন, ''অসুবিধে না হলে পটল নিয়ে এস।''

অমিত কিন্তু মোটেই কোলকাতা যায় নি, সোজা গেছে সুভদ্রার শহরে, সেখানেই দুজনের বিয়ে হল, বিয়ের পরে মধুচন্দ্রিমা যাপনে বোম্বাই।

তখনকার দিনে মোবাইল ফোন তো ছিলই না, ল্যান্ড-লাইন ফোনও ছিল বিরল। কোনো খবর পাঠাতে ডাকযোগে, কোলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোরে কম করে ৫ দিন লাগতো। তাই বলে এই সব খবর কখনও চাপা থাকে ? আমাদেরই বন্ধুমহলের কেউ কোন কারণে বোম্বাই গিয়েছিল, ফিরে এসে জানাল অমিত সুভদ্রাকে বিয়ে করেছে, জুহুর বালুকা বেলায় সুখী নব সম্পতিকে দেখা গেছে।

যথা সময়ে অমিতের দুসপ্তাহের ছুটি শেষ হল, অমিত কিন্তু প্রফেসরের অনুরোধ ভোলেনি, বোম্বাই থেকে ২ কেজি পটল কিনে ব্যাঙ্গালোরে ফিরে এসে প্রফেসরের ঘরে হাজির। প্রণাম করে বলল, ''স্যার, এই সকালের গাড়ীতে ফিরলাম। আপনার জন্যে কোলকাতা থেকে ভালো পটল নিয়ে এসেছি।'' প্রফেসর হাসি মুখে পটলের থলি হাতে নিয়ে বললেন, ''কোলকাতায় পুজো কেমন কাটালে ?'' অমিত গদগদ, ''দারুণ স্যার, চার বছর পরে পুজোয় কোলকাতা গেলাম, খুব মজা করেছি।'' প্রফেসরের হাসি এবার ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে, ''বাঃ, ভালো লাগছে শুনে, তা — আমার বউমা কেমন আছে।''

অমিত কল্পনাও করেনি যে আমরা সবাই, মানে প্রফেসর সমেত, সব জেনে বসে আছি।

ও-হো, একবার গল্প করতে বসলে আর কাজ হয় না। দেখো কেমন গন্ধ বেরোচ্ছে, পোস্ত-পটল বোধ হয় প্রায় রেডী। এবার গ্যাসটা কমিয়ে দাও। আর একটু মাখা-মাখা হলে নামিয়ে নিতে হবে। এখনো খানিকটা পটল বাকি আছে দেখছি, এটা দিয়ে অন্য কিছু বানানো যাক। খোসাটা আস্তে আস্তে বার করে নিই। একটা মজার মিস্টি বানাবো। বাড়ীতে ক্ষীর আছে ? নেই ? ওই তো, একটা নন্দিনীর পেঁড়ার বাক্স দেখতে পাচ্ছি। কয়েকটা পেঁড়া হাতে নিয়ে চটকে নিই আর তাতে দিলাম এলাচ আর দারচিনির টুকরো। পটলের একদিকে কেটে একটা চামচের পেছন দিয়ে ভেতর থেকে কুরে বার করে নিলাম। এবার ওই মিশ্রণ ভেতরে পুরে দিলাম, রান্নাটা মাইক্রো-ওয়েভে করছি, তাড়াতাড়ি হবে। বাটিতে অল্প জল দিলাম, আর তার মধ্যে পটল চারটে সাজিয়ে দিলাম। এবার মাইক্রো-ওয়েভে ৫ মিনিট।

দেখো পোস্ত-পটল হয়ে গেছে, নামিয়ে সোজা টাবিলে একটু ঠান্ডা হোক, লংকা চিরে ওপরে সাজিয়ে দাও। পটলের মিষ্টিও হয়ে এসেছে, পটলের ওপর একটু চিনি ছড়িয়ে আবার মাইক্রো-ওয়েভে দাও ৫ মিনিট।

এখনো হাসছ ? পটলের গল্পটা মনঃপুত হয়েছে তাহলে ? এখন দুই রান্নাই রেডী অত গরমও নেই যে জিব পুড়ে যাবে।

পোস্ত-পটল দারুণ হয়েছে, তবে ঝাল বেশী লাগছে। আমি আবার বেশী ঝাল খেতে পারি না, তোমাদের পক্ষে বোধ হয় ঠিক আছে। লোভ সামলানো যাচ্ছে না, দেখি আর একটু খাই।

ওঃ ভীষণ ঝাল ! তাড়াতাড়ি ওই মিষ্টি পটলটা দাও, ঝাল কাটবে।

বাবারে ! ভাগ্যিস মিষ্টিটা খেলাম, তা নাহলে বেশী ঝাল পোস্ত-পটল খেয়ে আমারই পটল তোলার উপক্রম হয়েছিল।

Dr Joy Mukhopadhyay lives in Bangalore. He holds a Masters Degree from IIT Kharagpur and a PhD from IISc, Bangalore. He worked in Industry and Academics and presently a Visiting Professor at different Institutes in Bangalore and other places in India. He takes a deep interest in Arts and Literature and Dabbles with creative writing in Bengali and English.

রম্যরচনা

ছট পরব — সূর্যের আরাধনা

মমতা দাস

'বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি দেশে দেশে কতনা নগর, রাজা, রাজধানী' . . . .

পৃথিবীর কথা থাক, নিজের দেশের কথাই কতটুকু জানি আমরা ? পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং এখন ঝাড়খন্ড । আমাদের বাংলাকে ঘিরে রেখেছে, কবির ভাষায় বলি —

'শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট / সাগর উর্মি ঘেরিয়া জংঘা / বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার / পঞ্চসিন্ধু যমুনা-গঙ্গা . . . .' এতো গেল মানচিত্রগত বর্ণনা । মানসিক চিত্র হিসাবে বাংলা ও বাঙালির অনেকটাই মিল আছে আসাম-বিহার-উড়িষ্যার সঙ্গে । আসাম তবুও ভৌগোলিক দূরত্বের নিরিখে অনেকটাই দূরে । বাস-এ যাওয়া যায় না । ট্রেন-এ যাওয়া সময় এবং ঝামেলা সাপেক্ষ । প্লেনে যাওয়া যায় সহজে, কিন্তু সেটা সাধারণের আয়ত্বের বাইরে । অতএব দূরত্ব একটা থেকেই যায় । কিন্তু বিহার-উড়িষ্যা ? এইদুটি রাজ্য তো আমাদের প্রায় ঘরের লোক, অথবা অতি নিকট প্রতিবেশী ! ট্রেনে মাত্র কয়েক ঘন্টার যাত্রাপথ । রাজনৈতিক কারণ ছাড়া সাধারণ বিভেদ চোখে পড়ার মত নয় । বরং অমিলের থেকে মিলটাই চোখে বেশি পড়ে । মাছ-ভাতখাওয়া, সর্ষেরতেলে রান্না, শাড়ি-ধুতি পরা, সধবা মহিলার শাঁখা-সিঁদুর এই সাধারণ মিলগুলো খুব সহজেই নজরে পড়ে । যুগযুগান্ত ধরে এই প্রদেশগুলির সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক, আর্থিক, সামাজিক এবং মানসিক আদান-প্রদান অব্যাহত । তবুও আমরা প্রায় কিছুই জানিনা এই প্রদেশগুলির ছোট-খাট ব্রত-উৎসব সম্পর্কে । তারাও আমাদের সম্মন্ধে কতটুকু জানে, সেটাও কোনদিন ভেবে দেখিনি । যাক অনেক বাজে বকছি, জানি পাঠকদের বিরক্তির উদ্রেক হচ্ছে, তাই আসল কথায় আসি ।

'ছট' বিহারের একটা বড় পরব । কলকাতায় এবং বাংলার বিভিন্ন স্থানে বহু বিহারী মানুষের বাস । আজ নয়, কয়েক শতাব্দী ধরেই বাঙালী বিহারে এবং বিহারীরা বাংলায় আসে-থাকে-বসবাস করে । তবুও আমরা প্রায় কিছুই জানি না । ওরাও আমাদের উৎসব সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা সন্দেহ ! যাই হোক, সংক্ষেপে একটু বলার চেষ্টা করছি . . . দীপাবলির ঠিক ছয় দিন পরে, কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করা হয় । প্রাচীন তথ্য অনুসারে কুমারী কুন্তীর সূর্যকে আবাহন ও তাঁর দ্বারা সন্তান কর্ণকে লাভ করার পর কুন্তী এই ব্রত করেন । অন্যমতে রাজা প্রিয়ব্রতর সন্তান হীনতা দূর হওয়ার পরেও মৃত সন্তানের জন্ম হতে থাকে তাঁর । তখন দেবী ষষ্ঠী নিজে এসে সেই সন্তানের প্রাণদান করেন । ছট বা ষষ্ঠী দেবী, সূর্যের বোন বলে পরিচিতা । তাই এই ব্রতের দিন ষষ্ঠী এবং সূর্য দুজনেরই আরাধনা করা হয় । এই পরবে দেবী ষষ্ঠী এবং তার ভাই সূর্যের পূজা করা হয় । ষষ্ঠীদেবী বাচ্চাদের ভালো রাখার দায়িত্ব নেন । কাজেই তাঁকে পুজো করা মানে শিশুদের কল্যাণ কামনা করা ! খুব সুন্দর ধারণা । আমার খুব ভালো লাগলো ।

এই একই উৎসবে সূর্যের পুজো করা হয় । সূর্য পৃথিবীর সমস্ত জীবনী শক্তির উৎস । সেই জন্য পূজা । উদীয়মান এবং অস্তগামী সূর্যের এই দুই রূপেই পূজা করা হয় । উদীয়মান সূর্য তো জীবন দায়ী । অস্তমান সূর্যকে পূজা করার কারণ হল মানুষকে উৎসাহ দিয়ে জানানো যে সূর্য অস্ত গেলেও চিন্তার কারণ নেই, পরের দিন আবার নূতন সূর্য আসবে জীবনের জয়গান শোনাতে । রামায়ণ, মহাভারত দুই মহাকাব্যেই ছট পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় ! অতীতে বিহার এবং উত্তর প্রদেশের পূর্ব দিকের যায়গা গুলিতে এই ব্রত পালন করা হত । সেই সময় দূরদূরান্ত থেকে প্রবাসী বিহারীরা নিজের স্বস্থানে ফিরতেন । বর্তমান ব্যস্ততার জীবনে সেটা সর্বদা সম্ভব হয় না । সেই কারণে এখন বিহারের মানুষরা পৃথিবীর যেখানেই থাকুন, এই ব্রত পালন করেন ।

ব্রতর নিয়মাবলী কঠিন এবং অবশ্য পালনীয় । চতুর্থীর দিন সারাদিন উপোস, সন্ধ্যায় কাঠের উনুন জ্বেলে লুচি এবং পায়েস রান্না করে খাওয়ার নিয়ম । পঞ্চমীতে নুন ছাড়া খাবার খাওয়া । ষষ্ঠীতে নির্জলা উপবাস, সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্যকে

পুজো অর্ঘ্য প্রদান। সপ্তমীর সকালে সূর্যকে অর্ঘ্য দিয়ে, জল গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করা, এই মোটামুটি নিয়ম। কোন নদী-পুকুর বা অন্য কোন জলভান্ডারের কাছে এই ব্রত করা হয়। পরিবারের যে কোন সদস্য এই ব্রত করতে পারে। তবে সাধারণত বাড়ির সবচেয়ে প্রবীণা, অথচ শারীরিক ভাবে সক্ষম মহিলা সদস্য এই ব্রত করেন। পুরুষ সদস্যরা বড় ঝুড়ি বা পিতলের সাগলায় করে পূজার উপচার ফলমুল বয়ে আনে। যারা এভাবে বয়ে আনে, তাদের নাকি বিশেষ জারাপুন্য লাভ।

এই ব্রতের উপাচার — ফুল-হলুদ-সিন্দুর-ধূপ-দীপ পঞ্চ শস্যের খাদ্য বস্তু, পঞ্চ ফল। প্রধানত বেতের কুলায়, অভাবে ডালা, বড় বাসনে পাঁচ রকম ফল, ফুল, পাঁচ রকম শস্যদানার গুঁড়ো দিয়ে তৈরি লাড্ডু ইত্যাদি নিবেদন করা হয়। ঠেকুয়া এই পূজার প্রধান বস্তু। আটা-ঘি-চিনি দিয়ে তৈরি এই সুমিষ্ট খাদ্য বস্তু ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করার নিয়ম। বিহারী বন্ধুর সঙ্গে গেছিলাম হরটিকালচারাল গার্ডেনে ছট পূজা দেখতে। গার্ডেনের ভিতরে যে লেক আছে তার কাছেই উদযাপিত হয়েছিল এই ব্রত। দেখলাম ডালা-কুলায় পাঁচ রকম ফল ইত্যাদি সাজিয়ে কোমর জলে দাঁড়িয়ে দেবতাকে নিবেদন করা হচ্ছে। মূলত মহিলারাই অংশগ্রহণ করলেও, অনেক পুরুষকেও দেখলাম একই ভাবে পূজা করছে। তার মানে সেটাও নিয়মে গ্রাহ্য ! ভাল লাগল। সাধারণত দেখা যায় সবরকম ব্রত-পূজাতেই কষ্ট এবং কৃচ্ছসাধনের ভাগটা মহিলাদের আর মিষ্টান্ন, সুখাদ্য ইত্যাদি ভোগের ভাগটা পুরুষের (অবশ্য মহারাষ্ট্রে শনি সিংনাপুরে একেবারে বিপরীত ব্যবস্থা দেখেছি)। দেখলাম প্রথমে জলের ধারে পূজার উপচার, অনেক প্রদীপ ইত্যাদি সাজিয়ে পুজো হচ্ছে। তারপরে ডালা-কলায় সাজানো পূজাসামগ্রী নিয়ে জলে নেমে আরাধনা। আরও দেখলাম আস্ত কলার কাঁদিতে হলুদ-সিন্দুর মাখিয়ে, জ্বলন্ত ধূপকাঠি জ্বালিয়ে তাকেও জলে ডুবিয়ে আনা হচ্ছে। চারদিকে উৎসবের পরিবেশ, ঢাকঢোল ইত্যাদি বাজনা, সুন্দর সুসজ্জিত মহিলারা ঘুরছে। হাস্যমুখর জনতা, আনন্দময়, শিশুদের কলরবে সানন্দ। সুন্দর চারদিক। আনন্দ এবং হাসির এই উপহারটুকুই মস্ত পাওয়া। যাইহোক, দিনফুরিয়ে আসছে, সূর্য দেব পাটে বসেছেন। অতএব মনে উৎসবের রেশ নিয়ে ফিরে এলাম। শিশুদের কল্যাণের জন্য এই ব্রত। এই ব্রত সার্থক হোক, পৃথিবীর সব জারগার সব শিশু ভাল থাকুক এই শুভকামনা আমার .....

পুঃ-

যতটুকু শুনেছি এবং বুঝেছি সেটুকু লিখলাম। ভ্রম থাকার সম্ভাবনা আছে, অনিচ্ছা কৃত ভ্রমের জন্য সবিনয়ে মার্জনা প্রার্থনীয়।

মমতা দাস (ভট্টাচার্য) — স্বাধীনতার কিছু পরে ওপার বাংলার (তখন পাকিস্তান) সিলেট জেলায় জন্ম। তিন বছর বয়সে শিকড় উপড়ে এপার বাংলায়। জীবনের প্রয়োজনে দেশের নানাপ্রান্তে, বিদেশেও প্রবাসী জীবন। দীর্ঘপ্রবাসের পর কলকাতায় ফেরা। যৌবনের ছেড়ে যাওয়া শহরটা বদলে গেছে। মন খারাপ। তবু লিখে যাওয়া। তিনটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশের পর দুটি কাব্য গ্রন্থ। ইতিমধ্যে মুম্বাই, ডুয়ার্স এবং কলকাতার বিভিন্ন কাব্য সংকলনে অন্য কবিদের পাশে স্থান পাওয়া। বাংলাদেশ থেকেও সংকলনে কবিতার স্থান লাভ। সতত নিরত সাহিত্য চর্চায়। পেশা নয়, নেশা।

কথামালা ২০১৮ — মিশিগান লিটারারি অ্যান্ড থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে বাংলা সাহিত্যের সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ২৩-২৫শে মার্চ

স্থান — রিভারসাইড আর্ট সেন্টার, অ্যান আরবার, মিশিগান

উত্তর অ্যামেরিকা এবং কানাডায় বসবাসকারী বহু বাঙ্গালী কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক বিভিন্ন ভাবে বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করে চলেছেন। কখনো এককভাবে, কখনো সাংগঠনিক উদ্যোগের মধ্যে।

কথামালার উদ্দেশ্য দুই বাংলার সাহিত্য প্রেমীদের এক মঞ্চে আনা যেখানে পরস্পরের ভাবনা চিন্তার আদান প্রদান, লেখা পড়ার, শোনার ও মতামত দেবার সুযোগ থাকবে।

এই সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র, কবি যশোধরা রায়চৌধুরী, গল্পকার ও অনুবাদক মুজাফ্‌ফর হোসেন।

পুরো সম্মেলনের কর্মসূচী জানার জন্য দেখুন —

http://milits.org/site/index.php/kathamala-2/

এই সম্মেলনে বাংলা গল্প, কবিতা, অনুগল্প, প্রবন্ধ ছাড়াও থাকছে অনুবাদ সাহিত্য। থাকছে ইংরাজী সাহিত্য — বিষয় ''বাঙালি অভিবাসী''। থাকবে চিত্রকলা প্রদর্শনী। স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা এই সম্মেলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সাহিত্যের আড্ডা, বাংলা বইমেলা, বই প্রকাশনা এবং এমন আরও অনেক আয়োজন যা না হলে তিনদিনের এই বই পাড়াটা জমে উঠবে না।

সম্মেলনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সঙ্গে আছে বাতায়ন, গল্পপাঠ, গুরুচণ্ডালী। আপনারাও আছেন তো ? যোগাযোগ করুন বাতায়নের সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে অথবা মেইল করুন —

biswadip9@gmail.com।

Wish you all a Happy 2018

“যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি”